দেশান্তরী

দেশান্তরী

ইন্দ্রনাথ

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ

৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

প্রথম
সংস্করণ :
৭ই ভাদ্র, ১৩৬১

আড়াই টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

শ্রীঅরবিন্দ রায়



এই বইয়ের রচনাকাল ১৯৪৯ ও ১৯৫৪ সালের মধ্যে, নামকরণ ১৯৪৯ সালে। য়োরোপের কোনো কোনো দেশে অল্প কিছু পরিবর্তন ঘটেছে ইতিমধ্যে।

৬ই ভাদ্র
১৩৬১

লেখক

প্রথম খণ্ড

হল্যাণ্ড

লণ্ডন থেকে আম্‌স্টার্ডাম কতই বা দূর, কিন্তু দিন কেটে গেল পৌঁছাতে। লিভারপুল-স্ট্রীট স্টেশনে ট্রেনে চড়লাম সকালবেলা, রিজার্ভ করা স্থান দখল করে ছুজনে বসলাম জানলার পাশে। বাইরে ইংলণ্ডের রেলস্টেশনের গতানুগতিক কালিমাখা মূর্তি, ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশটা যেন আরো বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। কিন্তু আর কতক্ষণ! কয়েক মিনিটের মধ্যে এই স্টেশনের অন্ধকূপ থেকে নিষ্ক্রান্ত হব, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই ভেজা কম্বল-চাপা দ্বীপটার সীমানা ছাড়িয়ে পাড়ি জমাব উষ্ণ, বিচিত্রতর নানা দেশের দিকে; যেখানে এখন ভরা গ্রীষ্মের প্রলম্বিত দিনের রোদে প্রকৃতির চেহারা উৎফুল্ল, অকুণ্ঠিত; লোকের মনে খুশির ঔজ্জ্বল্য,—অবশ্য যুদ্ধ-শেষের মাত্র ছুবছরের মধ্যে খুশী হবার ক্ষমতা যদি তারা ফিরে পেয়ে থাকে।...

হারউইচ বন্দরে শুল্কবিভাগের পরীক্ষাপর্ব। টাকা বেশী নিচ্ছি কিনা সেটাই পরীক্ষার প্রধান অংশ। মুদ্রা-সংকটের জন্য

মাথাপিছু মাত্র ৭৫ পাউণ্ড বরাদ্দ। একটা সুবিধা আছে: ইংলণ্ডের থেকেই ওসব দেশের ট্রেনের টিকিট কিনতে পেরেছি— সেটা এই বরাদ্দর বাইরে।

খেয়া ছাড়তে দুপুর পেরিয়ে গেল। ছোট দোতলা জাহাজ। সামনে প্রথম শ্রেণী, পিছনে দ্বিতীয়; আরামের বিশেষ তারতম্য নেই। ডেকের উপরে বেঞ্চি সাজানো। ইংলণ্ডের উপকূল যখন আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে হঠাৎ পেটে খিদে চনচনিয়ে উঠল। লক্ষ করলাম ডেক প্রায় খালি; অর্থাৎ, শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য খেতে অভ্যস্ত যত সব ইংলণ্ডবাসী প্রথম সুযোগেই ছুটেছে নিচে, উপাদেয় ব্যঞ্জনের সঙ্গে সাক্ষাত করতে। যুদ্ধের পরে সম্প্রতি অনেকেই বেড়াতে যাচ্ছে কন্টিনেণ্টে দেশ দেখার উদ্দেশ্যে নয়, রসনার পরিতৃপ্তির লোভে।

ওলন্দাজী পাকে ও পরিবেশনে তৃপ্তিও হল। থালা জুড়ে প্রকাণ্ড চাঁদামাছ ভাজা। ইংলণ্ডেও খেয়েছি এ জিনিস, কিন্তু এত সুস্বাদু নয় বলাই বাহুল্য। ইংলণ্ডের চেয়ে দামও বেশী— তাও বোধ হয় বলাবাহুল্য।

বিকেলে এসে ঠেকলুম বন্দরে। নাম Hook of Holland বা 'ওলন্দাজী বড়শী'। শুল্কবিভাগের পালা শেষ করে স্টেশনে এসে দেখি ভীড়ের ঠেলায় গাড়িতে চড়া দায়। ভাগ্যক্রমে জায়গা জুটল দুটো। ট্রেন ছাড়তে কিছু দেরি আছে এবং কত

রাতে আশ্রয়ে গিয়ে পৌঁছাব জানি না, এখানেই খাওয়া সেরে নেওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করে ঢুকলাম সংলগ্ন রেস্তরাঁতে। জানলায় সাজানো অনবদ্য এক কুক্কুট-কাবাব পর্যটকদের জিভে জল আনছে। আহারের পরিতৃপ্তির পর জিভ শুখাল বটে, কিন্তু দাম দেখে চোখ এল ভিজে। ঘাটে এক পা রেখেই এতগুলি কড়ি দিয়ে দিলাম, শেষ পারানির পয়সা কিছু থাকবে তো! এমনি আরো কত ঘাটের জল খেতে হবে কে জানে!

এখানে বৈদ্যুতিক ট্রেনের তার মাথার উপরে, ইংলণ্ডের মত মাটির সঙ্গে নয়। চলন্ত ট্রেনের বহির্দৃশ্যও নতুন ঠেকল নানা জায়গায়। এদেশের অধিকাংশই সাগর-বক্ষের চেয়ে নিচু—এই অঞ্চল তো বটেই। মাটি ভেদ করে জল অতি সহজে বেরিয়ে আসে। চতুর্দিকে তাই কৃত্রিম বাঁধ আর সরু খালের সুনিয়ন্ত্রিত নক্‌শা এবং, বলাবাহুল্য, অবশ্যম্ভাবী হাওয়া-কল (windmill)। শহরের বাইরে এদেশের প্রায় সর্বত্র আকাশের গায়ে হাওয়া-কলের চতুর্পক্ষ মূর্তি চোখে পড়বেই—অতিকায় এক পাখি যেন ধ্যানস্থ হয়ে আছে শান্ত সুন্দর পল্লী প্রান্তরের মধ্যে। ট্রেনের পথে কিছুক্ষণ পরপরই আসছে ছোট ছোট পরিষ্কার শহর। বাড়িগুলি ইংলণ্ডের মত নিদ্রিতপুরী নয়, সামনে বারান্দা প্রায়ই চোখে পড়ে, লোকজনের চলাফেরা কাজকর্ম খাওয়া-দাওয়া নজরে আসে। বড় শহরের মধ্যে ডেল্‌ফ্‌ট, হার্লেম ও

রটারডাম পথে পড়ল। যুদ্ধের প্রথম দিকে কাগজে পড়েছিলাম, রটারডামে জার্মানরা জ্যামিতিক পদ্ধতিতে বোমা-বর্ষণ করেছে, সূচ্যগ্র ভূমিও বাদ পড়েনি। কিন্তু অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির সামনে স্বাভাবিক পথঘাট এবং ঘনঘন বিস্তীর্ণ প্রান্তর ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। হয়তো যা শুনেছি সবই মিথ্যা, শূন্য আস্ফালন মাত্র! লণ্ডনেও যে ধ্বংশ চোখে পড়ে এর চেয়ে অনেক বেশী! ভুল ভাঙল জনৈক ওলন্দাজ সহ-যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করে: যা দেখছি সবই নাকি ধ্বংশ, ঐ 'উন্মুক্ত প্রান্তর' ছিল বাস-ঘন জনপদ,—জার্মানরাই তা উন্মুক্ত করেছে, এবং এমন সম্পূর্ণভাবে যে সাক্ষীস্বরূপ একখানা আধ-ভাঙা ঘরও দাঁড়িয়ে নেই আর। ভেবে দেখলাম শহর সত্যিই কোনো দেশে এতখানি ফাঁকা হতে পারে না।

অবশেষে আমস্টার্ডাম। রাত তখন দশটা, কিন্তু দিনের আলো সবে ফুরিয়েছে। স্টেশন থেকে বেরিয়েই এক খালের ওপারে আলো-ঝলমল প্রকাণ্ড হোটেল। ক্লান্ত দেহ পা বাড়াতে চাইল সেদিকে, হুঁসিয়ার মন রাশ টানলে। সেতু পেরিয়ে উল্টো পথটাই ধরলাম; কিন্তু আর কোনো হোটেল চোখে পড়ে না, উপরন্তু ইংরেজী বোঝে না কোনো পথিক। হাতের সুটকেসের ভার যেন প্রতি মিনিটে দ্বিগুণ বেড়ে যাচ্ছে এমন সময় সাক্ষাত এক নিগ্রো পথচারীর সঙ্গে। দেখা গেল ইংরেজী

সে জানে (এবং তাছাড়া আরো তিনটে য়োরোপীয় ভাষা ছুটন্ত বলতে পারে)। সস্তা পান্থশালা? হ্যাঁ, তার জানা আছে—এই দু পা এগিয়েই। সে-ই আমাদের পৌঁছে দেবে।

হাতের বাক্স হঠাৎ অনেকখানি হাল্কা হয়ে গেল। অল্প পথটুকু যেতে যেতে জানলাম আমাদের ত্রাণকর্তার নাম উইলি, বাড়ি ডাচ্ গিয়ানা (Guiana), আইন পড়ছে এদেশে। নাতিপ্রশস্ত এবং নাতিপরিচ্ছন্ন এক গলির গহ্বরে কিছুদূর এগিয়ে এক বাড়ির দরজা খুলে ধরলে সে। ঢুকে দেখি সরু লম্বা একটা ঘর। প্রথমেই ডানপাশে 'বার', তার পরিচারিকার সঙ্গে আলাপ করলে উইলি। মেয়েটি আমাদের পাসপোর্ট পরীক্ষা করলে, তারপর জানালে ঘর পাওয়া যাবে। ভাড়াও অত্যধিক নয়। শুনে মনটা তাজা হল, দেহ তাজা করবার জন্য এবং উইলিকে খুশী করবার জন্য বীয়ার হুকুম করলাম। কল থেকে বার হল দুগ্ধফেননিভ পানীয়, ফেনা মরে যাবার পর দেখি গ্লাসের নিচে পড়ে আছে মাত্র ইঞ্চিখানেক তরলপদার্থ। এতখানি বায়বীয় বীয়ার ইতিপূর্বে দেখিনি আর। যাই হক, তাইতেই ছোট এক চুমুক দিয়ে তাকালাম ঘরের অপরাংশের দিকে। তামাকের ধোঁয়ার আবিলতার মধ্যে চোখে পড়ল গোটাচারপাঁচ গোল টেবিল ঘিরে খরিদ্দারদের ভীড়। অধিকাংশই ইন্দোনেশীয় যুবক, হয়তো ছাত্র হবে,—সঙ্গিনীদের সঙ্গে গল্প করছে সুরার

পাত্র নিয়ে। গ্রামোফোনে বাজছে হ্যারি জেম্‌স-এর ব্যাণ্ড, দুএকটি যুগল নাচছে তারি তালে তালে। মার্কিন সঙ্গীত, ওলন্দাজ মেয়ে ও যবদ্বীপীয় পুরুষের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে অভিনব এক আন্তর্জাতিক ছন্দ। এসবেরও ওপারে দেখা যাচ্ছে দুটি দরজা—একটি অন্ধকার, অন্যটির ভিতরে নজরে পড়ে এক সরু সিঁড়ির পাদদেশ।

ইতিমধ্যে শহর দেখাবার অবৈতনিক গাইডের পদে উইলিকে আমরা বাহাল করেছি। সুতরাং আরো কয়েক গ্লাস বীয়ার দিয়ে তাকে তুষ্ট করা হল। অবশেষে রাতের মত বিদায় নিয়ে আমরা পা বাড়ালাম ঘরের দিকে। অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং খাড়া সিঁড়ি, কোনো পাশে ধরবার কিছুই নেই। অতিকষ্টে তিনতলায় উঠে নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকে চমকে গেলাম। ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আসবাবের মধ্যে মাত্র এক যুগল-খাট, একটি চেয়ার ও বেসিনের সঙ্গে জলের কল। এটা যে ঠিক রাজার হালে বাস করবার জায়গা নয় তা নিচেই টের পেয়েছিলাম, কিন্তু এতটা দারিদ্র্যও ভাবলে আশা করিনি। যাই হক, দেহ এত ক্লান্ত যে ও কারণে ঘুমের ব্যাঘাত হবে বলে মনে হল না। জামাকাপড় ছেড়ে দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি খিলটা ভাঙা। ভাগ্যক্রমে খাটে উঠতে গিয়ে সেটা ভেঙে পড়ল না, অবিলম্বে নিদ্রা এসে সারাদিনের ক্লান্তি হরণ করলে।

তখন কত রাত্রি জানিনা। শুধু এটুকু মনে আছে যে কী কারণে হঠাৎ মুহূর্তের জন্য ঘুম ভাঙল; চোখ খুলে দেখি ঘরে জ্বলছে প্রখর আলো এবং চেয়ারে বসে একটি লোক আমার মুখের কাছে তার শীর্ণ মুখখানা এনে একদৃষ্টে দেখছে আমাকে। আমি বললাম "হ্যালো", জবাবে সেও ঐ শব্দটি উচ্চারণ করলে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

পরদিন সকালে উইলির সঙ্গে বেরোলাম শহর দেখতে। নির্মল আকাশ, সোনালী রোদ। রানীর প্রাসাদের পাশ দিয়ে এসে এদের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রাজপথে পড়া গেল—নাম কাল-ভার্স্টাট (Kalvarstaat)। দুপাশে দোকান, আপিশ, রেস্তরাঁ, সিনেমা। তখন সবে দোকান খুলছে একে একে, ব্যস্ত সমস্ত লোকজন চলেছে কাজে। সম্ভ্রমের অনুপাতে রাস্তাটা কিন্তু মনে হল অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ এবং নোংরা। আম্-স্টার্ডামের অধিকাংশই লণ্ডনের চেয়ে অপরিষ্কার। পথ চলা-চলের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এদের নজরে পড়ল: গাড়ি চলে রাস্তার ডানপাশে; বিভিন্ন দিকের পথিক হাঁটে বিভিন্ন ফুটপাথে।

হঠাৎ একসময় চোখে পড়ল অদূরে এক ব্যক্তি তার ক্যামেরা বাগিয়ে ধরেছে আমাদের লক্ষ করে এবং মনে হল যেন বোতামও টিপলে। কাছাকাছি আসার পর জানালে আমাদের একখানা চমৎকার স্ন্যাপ্ সে নিয়েছে, সামান্য কিছু পয়সা দিলে

অনতিবিলম্বে ছবি আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে। তাকে অবশ্য এড়িয়ে যাওয়া যেত, কারণ ছবি তো আমরা তুলতে বলিনি ; কিন্তু এসব ক্ষেত্রে অনেকে সংকোচের কাছে হার মানে, নয়তো এদের ব্যবসা চলত না। পয়সা এবং নামধাম নিয়ে ক্যামেরাম্যান হঠাৎ বললে, “আচ্ছা আরেকখানা ছবি নিচ্ছি তোমাদের, দুটোর মধ্যে যেখানা ভাল হয় সেটি পাঠাব।”

বোঝা গেল, প্রথমবার সে বোতাম টেপার ভান করেছে মাত্র, এবং ছবি না নিলেও কোনো ক্ষতি হত না তার। অনেকে নাকি শুনেছি চাতুরিতে এরও উপরে যায়,—তারা বলে, মনে হল তুমি ইশারায় ছবি তুলতে বলছ, তাই তুলেছি। এই অভিজ্ঞতার পরে কিন্তু লণ্ডনের রাস্তায় একবার এমনি এক লোককে জব্দ করবার সুযোগ নিতে গিয়ে নিজেকেই বোকা বনতে হয়েছিল। তার বোতাম টেপাকে ছল মনে করে বললাম —ছবি নেব, কিন্তু দ্বিতীয়বার ছবি তোলা চলবে না। দুদিন পরে সত্যিই সেই ছবি এসে হাজির হয়েছিল।

দেখবার কী আছে এ শহরে?…উইলি প্রথমে প্রশ্নটা বুঝতে পারলে না ; এই তো শহর দেখছি—কন্টিনেণ্টাল শহরে দিনদুপুরে আর কী দেখবার থাকে! সন্ধ্যার পরে যখন শহর জেগে উঠবে তখন যাওয়া যাবে রেম্ব্রাণ্ট্ স্কোয়ারে।

কিন্তু তার তো অনেক দেরি। ইতিমধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা

শুধু দোকানের পণ্যসম্ভারের দিকে লুব্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে সময় কাটানো বিশেষ লোভনীয় মনে হল না। উইলি ভাবিত হল, চেহারা দেখে মনে হল হয় এ শহরে দর্শনীয় বড় কিছু নেই, নয়তো সে এসব বিষয়ের চেয়ে নৈশ প্রমোদের প্রসঙ্গে অনেক বেশী ওয়াকিবহাল। যাই হক, ওর চিন্তাশক্তিকে সময় দিতে এবং আমাদের ক্লান্ত পায়ের বিশ্রামের জন্য একটি খোলা কাফেতে এসে বসা গেল। রাস্তার উপরে সামিয়ানার নিচে বেতের চেয়ার টেবিল পাতা। কফিতে চুমুক দিয়ে নজরে পড়ল অদূরে কাঠের ফ্রেমে স্তরে স্তরে সাজানো ছবির পোস্টকার্ড। আবিষ্কার করা গেল এদের সরকারী চিত্র-মন্দিরের (Rijks-museum) ছবি। উইলি বললে, "বাড়িটা দেখেছি বটে, তবে ভিতরে ঢুকবার সময় হয়নি এযাবৎ। চল যাওয়া যাক।"

ভিতরে খুব প্রসিদ্ধ বিশেষ কিছু চোখে পড়ল না, এক রেম্ব্রাণ্ট-এর শিল্পসম্ভার ছাড়া। এই স্বনামধন্য প্রতিভার বাস ছিল এ শহরেই এবং এই প্রদর্শনীতেই বোধহয় আছে তার ছবির শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ।

দুপুরে এক রেঁস্তরাঁতে পরম তৃপ্তিসহকারে ভাত খাওয়া গেল। এদের খাদ্যতালিকায় ভাত অন্যতম নিয়মিত অংশ; বর্তমান ইংলণ্ডের মত কোনো সরকারী নিষেধাজ্ঞা নেই ভাত খাওয়ার বিরুদ্ধে। রেস্তরাঁয় খাওয়ার পরিমাণ সম্বন্ধেও নেই

কোনো আইন। এর পরে য়োরোপের আর যত দেশে গিয়েছি সর্বত্রই দেখেছি এই ব্যবস্থা : এক ফরাসীদের দু একটি সামান্য নিয়ম ছাড়া খাদ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে সরকারের কিছু বলবার নেই,—যতক্ষণ পেটে আছে খিদে এবং পকেটে পয়সা যত খুশি খাওয়া চলতে পারে। এক সুইৎসার্লাণ্ড ছাড়া তাদের আর সবাই গত মহাযুদ্ধের নিগ্রহ ভোগ করেছে, জার্মেনির পদানত হয়েছে। ইংরেজদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল, তাদের সম্পত্তির উপরও হাত পড়েনি কারো, কিন্তু আজ তারাই পায় না খেতে, পায় না পরতে। অবশ্য যেটুকু পায় তা মোটামুটি ভাগ হয় সমান ভাবে এবং বাজারে তার দামও চড়া নয় চ্যানেলের এ পারের মত।

আম্স্টার্ডামে স্থল ও জল, পথ ও ঘাট অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বাঁধানো খাল ও সেতু প্রতি পদে পদে। বিকেলের দিকে মোটরলঞ্চে চড়ে বেড়িয়ে এলাম জলপথে। খালগুলি এসে মিশেছে এক নদীতে, নদী গিয়ে পড়েছে উত্তর সাগরের মোহনায়। নদীর মধ্যে কিছুদূর ঢুকে ফিরে এলাম ভিন্ন রাস্তায়। গাইডের বক্তৃতার সাহায্যে শহরের অনেকাংশের সঙ্গে পরিচয় হল।

সন্ধ্যা হতে আসা গেল রেম্ব্রাণ্ট্ স্কোয়ারে। লণ্ডনের যেমন পিকাডিলি সার্কাস অথবা কলকাতার যেমন চৌরঙ্গী, এ শহরের এই জায়গাটি তাই। নিওন আলো, সিনেমা থিয়েটার নাচঘর,

হোটেল কাফে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কেমন যেন ফিকে—আমাদের কল্পনায় কন্টিনেণ্টাল রাজধানীর যে ছবি ছিল তার তুলনায় দুর্বল।

সেখানে সন্ধ্যাটা কাটিয়ে, পানাহার সেরে, নৈশভ্রমণ করতে করতে যখন ঘরে ফিরছিলাম মনে হচ্ছিল আজকের দিনটা বুঝি এখানেই শেষ হল। চ্যানেলের এপারে যে ইংলণ্ডের মত রাত দশটায় আমোদ প্রমোদের পাট চুকে যায় না এ তথ্য তখনো ধাতস্থ হয়নি। আমাদের পান্থশালার দরজা খুলে দেখি আসর গরম গতরাত্রির চেয়েও বেশী। বার-এ আজ স্বয়ং গৃহকর্ত্রী এবং তার স্বামী সপারিষদ উপস্থিত। আমাদের ধরে সজোরে তারা দলভুক্ত করে নিল। গৃহকর্ত্রী যৌবনের সীমাপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে, কিন্তু আঁটসাঁট হৃষ্টপুষ্ট দেহ। নাচ-বাদ্যের তালে তালে পা নাচছে তার আর এদিকে ভাঙা ইংরেজীতে আলাপ করছে আমাদের সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করলে স্বামী—নন্দকে চিনি কি আমরা? বহুকাল আগে স্বামীজী যখন ছিলেন এদেশে তখন সে বাড়িতে সে নাকি ছিল পরিচারিকা। হঠাৎ বার করলে একখণ্ড নারকোলের খোল, অনেক দূরে যবদ্বীপ অঞ্চল থেকে এসেছে এ জিনিস এ তথ্য জানিয়ে দু টুকরো এগিয়ে দিলে আমাদের দিকে। সধন্যবাদে ফিরিয়ে দিলাম,—ওর স্বাদ আমরা জানি, সুতরাং আমাদের দিলে অপাত্রে নষ্ট করা হবে দুর্মূল্য জিনিস।

স্বামীটি মধ্যবয়সী, কিছুটা আবহাওয়া-বিমর্দিত চেহারা। ছিল নাবিক, সম্প্রতি গৃহবাসী। দামী চুরুট উপহার দিয়ে সে আতিথেয়তা করলে। আমরা সবার হয়ে বীয়ার হুকুম করলাম।

যে মেয়েটি বীয়ার নিয়ে এল কাল তাকে চোখে পড়েছে বার-এর বাইরে—নাচের আসরে, বন্ধুসান্নিধ্যে। তাকিয়ে দেখি সেখানে আজ বসে আছে কাল যে করেছিল পরিবেশনের কাজ—পোশাক এবং প্রসাধনের পারিপাট্যে এখন তাকে চেনাই কঠিন। আর যে কজন সঙ্গিনী আছে তার আজ ওখানে তারাও হয়তো পালা করে আসে বার-এ। সপ্তাহে এক সন্ধ্যা পরিবেশিকা, ছয় সন্ধ্যা অতিথি-সহচরী—এই বোধহয় এদের রীতি। দেখলাম মাঝে মাঝে দু একটি যুগল উঠে পিছনের অন্ধকার দরজা দিয়ে ভিতরে অদৃশ্য হচ্ছে। হাসিগল্পের মধ্যে গৃহকর্ত্রী আড়চোখে লক্ষ করছে সবকিছু। তার সঙ্গে মাত্র এই কয়েকমিনিটের পরিচয়, কিন্তু এরই মধ্যে যেন কিছুটা টের পেলাম কী ক্ষমতার গুণে যে ছিল একদা সামান্য পরিচারিকা আজ সে এমন সচ্ছল আরামের অধিকারী।

গল্প করতে করতে হঠাৎ মনে পড়ল গতরাত্রির অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা। মাঝরাতে এক অপরিচিত ব্যক্তি আমার মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে এমন আজগুবি সম্ভাবনা বিশ্বাস

করাই কঠিন মনে হল। ভাবলাম দুস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয় নিশ্চয়ই। আর বাস্তবই যদি হয়ে থাকে তো ঐ অবস্থায় কী করে অবলীলাক্রমে আবার ঘুম দিলাম ভাবতেও গা শিউরে উঠল। যাই হক, কথাটা বলেই ফেললাম। শুনে সামান্য বিস্মিত হয়ে গৃহকর্ত্রী ও কর্তা মুখ চাওয়াচাউয়ি করলে, তারপর জানালে আমাদের পাশের ঘরে এক আধপাগলা বুড়ো থাকে— এ নিশ্চয় তারই কীর্তি। নিরীহ লোক, কিন্তু মাঝরাতে উঠে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, দরজা ঠেলে, খোলা পেলে ঘরে ঢুকে বসে থাকে। আমাদের ঘরের খিলটা ভাঙা, আমরা যেন চেয়ার এবং বাক্স দিয়ে দরজা চেপে রাখি। (বলাবাহুল্য, এ উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে মান্য করেছি ; এর পরে আর কোনো উপদ্রব হয়নি।)

অনেক তামাক ছাই হল, অনেক গ্লাস শূন্য হল, তবু উঠে যখন শুতে গেলাম সকলে নিতান্ত অনিচ্ছায় বিদায় দিলে। রাত তখন অনেক, কিন্তু ঘরে ও বাইরে লোকজনের প্রমোদ-কাকলী স্তিমিত হয়ে আসেনি মোটেও, বরং একটু যেন বেসামাল হয়ে উঠেছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মনে পড়ল ইংলণ্ড এখন নিঝুম পুরী। কিন্তু হোটেল নাচঘর পানঘর খোলা থাকলেও, লোকের মনে ফুর্তি থাকলেও ইংরেজ সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে এদের মত এমন প্রাণ খুলে গলা ছাড়তে পারে না বোধহয়।

বেলজিয়াম

হলাণ্ডের পল্লীঅঞ্চলে কিছুদিন ঘোরাঘুরি করে অবশেষে একদিন বিকেলে ব্রাসেল্‌স-এর ট্রেনে চেপে বসলাম। বৈদ্যুতিক ট্রেন ছাড়া বাষ্পযান এদেশে চোখে পড়ল না। চ্যানেলের এপারে ইংলণ্ডের মত মুখে খবরকাগজ চেপে নিঃশব্দে ট্রেন-যাত্রার রীতি নেই—আলাপসালাপে সময় কাটে বেশী। এক বেলজিয়ান সহযাত্রীর সঙ্গে পরিচয় হল। ভদ্রলোক ব্যবসায়ী, মাঝে মাঝে হলাণ্ডে আসেন কাজে। রটারডাম অতিক্রমকালে হিটলার এবং জার্মানজাতির মুণ্ডপাত আরম্ভ করলেন; আর ইংরেজের প্রশংসা। ভারতে ইংরেজ-রাজত্ব ধ্বংশ করে আমরা মস্ত ভুল করছি এই তার মত; ইংরেজ আমাদের জন্য কত করেছে···যেমন করেছে বেলজিয়ানরা তাদের বৈদেশিক প্রজাদের জন্য !

ভদ্রলোকের সঙ্গে অনেক ব্যাপারে মতের মিল না হলেও তিনি আমাদের প্রতি বিরূপ হলেন না। কোথায় কোথায় বেড়াতে যাব জেনে নিয়ে কিছু কার্যকরী উপদেশ দিলেন।

আম্‌স্টার্ডামে হোটেলের অভিজ্ঞতা শুনে বললেন আসলে বড় হোটেলে সাধারণত দাম খুব বেশী নয় এবং সেখানেই ঠকতে হয় কম, যদিও বিদেশী পর্যটক আমাদের মত ভুল প্রায়ই করে থাকে।

সাড়ে নটায় ব্রাসেল্‌সে পৌঁছালাম। আমাদের এক ট্রামে তুলে দিয়ে সহযাত্রী বিদায় নিলেন ; এই ট্রাম-রাস্তার শেষপ্রান্তে নাকি আছে অনেক ভাল হোটেল। তখন সবে সন্ধ্যা হচ্ছে, আলো জ্বলে উঠছে দিকে দিকে। আম্‌স্টার্ডামের চেয়ে এ যে অনেক চকচকে ফ্যাশানত্নরস্ত শহর তা ট্রামে বসেই বোঝা গেল। রাস্তাঘাট প্রশস্ত, পরিচ্ছন্ন ; লোকজনের পোশাক পরিচ্ছদ সুন্দর এবং মূল্যবান ; বিরাট অট্টালিকার নিচে নিচে সুদৃশ্য দোকানের সারি পণ্যসম্ভারে উপছে পড়ছে। থিয়েটার নাচঘর হোটেলের চূড়ায় চূড়ায় প্রকাণ্ড চলন্ত বা ঘুরন্ত রঙিন আলোর ফুলঝুরি, নাচবাদ্যের বন্যা চারদিক থেকে রাস্তায় এসে পড়ছে। সেই আলো আর গানের রামধনু যত নৈশপ্রমোদ-কেন্দ্রে ডেকে আনছে বিত্তশালী নাগরিকদের—মসৃণ চকচকে গাড়ির স্রোত সিনেমা হোটেল কাবারে-র সামনে উদ্গার করে চলেছে সুসজ্জিত সুদৃশ্য নরনারী।

অবশেষে এক প্রশস্ত উন্মুক্ত চতুষ্কোণে এসে আমাদের গাড়ি দাঁড়াল। এইখানে নানাদিকের ট্রাম এসে ঘুরে ফিরে যায়। এককোণে এদের গার দ্যু নর (Gare du Nord) রেলস্টেশন।

অনেক আলোকোজ্জ্বল হোটেলের ছড়াছড়ি। যেটা সবচেয়ে জমকালো সহযাত্রীর উপদেশ স্মরণ করে তার মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম,—কিন্তু জায়গা নেই। দ্বিতীয় চেষ্টায় আশ্রয় পাওয়া গেল; বেশ বড় সুসজ্জিত ঘর, প্রকাণ্ড জানলার ওপারেই উপরোক্ত চতুষ্কোণের দৃশ্য অবারিত। দুটি শুভ্র কোমল শয্যা। দিনে মাথাপিছু যাট ফ্রাংক, অর্থাৎ টাকাছয়েক মাত্র—অবশ্য আহার বাদে। ভাল হোটেল সম্বন্ধে আমাদের সহযাত্রীর অভিমত অধিকাংশে সত্য প্রমাণিত হয়েছে শুধু এখানেই নয়, পরেও।

আশ্রয়ের চিন্তা দূর হবার সঙ্গে সঙ্গে খিদে যেন চাড়া দিয়ে উঠল পেটে। স্নান সেরে জামাকাপড় বদলে দেখি রাত এগারোটা বেজে গেছে। এত রাতে আহার কি জুটবে কোথাও—আমাদের গেঁয়ো মনে কিঞ্চিৎ সন্দেহের উদ্রেক হল। কিন্তু জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মনে হয় সবে সন্ধ্যা হয়েছে এদেশে। বেরিয়ে দেখি দোকানে দোকানে তখনো অবারিতদ্বার, আলোর তেজ কমেনি কোথাও। মার্কিন এবং সুইস্ পণ্যের ছড়াছড়ি—ঘড়ি ক্যামেরা কলম নাইলন টাইপরাইটার জামাকাপড়—ঠিক যেসব জিনিস ইংলণ্ডে দুষ্প্রাপ্য। এদেশে ডলারের কোনো অভাব আছে মনে হয় না। যেসব য়োরোপীয় দেশ বিগত যুদ্ধের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাদের মধ্যে বেলজিয়াম সবচেয়ে অক্ষত ও সচ্ছল। এখনো এদের ফ্রাংক পৃথিবীর দুর্মূল্য ও

দুষ্প্রাপ্য মুদ্রাশ্রেণীর অন্যতম। এর এক প্রধান কারণ এই যে এদেশের বিত্ত অধিকাংশে কলকারখানার উপর নির্ভরশীল এবং যুদ্ধে সেগুলির বিশেষ ক্ষতি হয়নি।*

চতুষ্কোণের এক কোণ থেকে শহরের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত রাজপথ চলে গেছে অনেক দূরে। সেদিকে বেড়াতে বেড়াতে এসে বসলাম খোলা এক কাফেতে। ব্যয়সংক্ষেপ আমাদের এক মস্ত মাথাব্যথা। অথচ শরীর ঠিক রাখতে হবে; দুর্ভিক্ষের দেশ থেকে এসেছি এবং আগামী কিছুদিন ক্রমাগত ঘোরাঘুরির ক্লান্তি সইতে হবে। খাওয়ার সময় খালি হিসেব করি দামের অনুপাতে কোনটা কতখানি পুষ্টিকর। এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ খাদ্য হচ্ছে ডিম—শুধু এ দেশে নয়, পরে অন্যত্রও তাই দেখেছি। সেরাতে খেলাম ডিম আর বেকন দিয়ে তৈরি এক উপাদেয় ভোজ্য। পয়সা যা দিলাম তা কলকাতার বর্তমান দামের চেয়ে বেশী নয়।

ঘরে ফিরবার পথে দুএকটি ফিটফাট যুবক মাঝে মাঝে সঙ্গ নিচ্ছিল। বলে, নাইট-ক্লাবে পৌঁছে দেবে, নৈশ প্রমোদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে—খুব কম খরচ! কখনো বা কোনো মনোহারিণী সুসজ্জিতা ললনা একটু থেমে একটু হেসে মৃদুস্বরে বলছে, "মস্যিয় ?"

* ভ্রমণ-ব্যবসার থেকেও এদের যথেষ্ট আয়; সম্প্রতি এক্ষেত্রে বেলজিয়াম য়োরোপের অন্যান্য সব দেশকে হার মানিয়েছে।

পরদিন হোটেলেই প্রাতরাশ সেরে বেরোলাম ব্যাঙ্কের খোঁজে। এদেশে পাউণ্ডের দাম কম, অর্থাৎ রাস্তায় চেক ভাঙালে সরকারী হার পাওয়া যায় না। ডলারের যথেষ্ট প্রতিপত্তি—সবাই বলে ডলার থাকে তো দাও, বেশী দাম দেব।

টাকা ভাঙিয়ে এক টুরিস্ট বাসের টিকিট কিনলাম। দুপুরের খাওয়ার পরে এদের ভ্রমণ শুরু হল। রাজার প্রধান প্রাসাদ এবং গ্রীষ্মাবাস ছাড়িয়ে গাড়ি চলে এল শহরের বাইরে, উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে। পথে পড়ল চৈনিক ও জাপানী দুটি সুচারু প্যাগোডা—সুপ্রসিদ্ধ প্যারিস প্রদর্শনীর থেকে কিনে এনেছিল এরা। Woluwe হ্রদ, Soignes বন। প্রথম মহাযুদ্ধে নার্স ইডিথ কাভেল এবং বেলজিয়ান বীরদের যেখানে গুলি করে মেরেছিল জার্মানরা দেখা গেল সে জায়গা। আরো কিছু দূরে একটি ছোট্ট দোতলা বাড়ি, সেখানে ভিক্টোর য়ুগো শেষ করেছিলেন তার 'লে মিজেরাব্‌ল'। বাড়িটা এখন এক সরাইখানা, নাম কোলোন হোটেল (Hôtel des Colonnes)।

অবশেষে ওআটার্লুর কাছাকাছি প্রসিদ্ধ রণক্ষেত্রে আসা গেল। প্রান্তরের মাঝামাঝি এক মনুষ্যনির্মিত পর্বত, তার সূচ্যগ্র চূড়ায় এক সিংহমূর্তি। ওআটার্লু যুদ্ধের এই অভিনব স্মারক গড়া হয়েছে শুধু স্ত্রী-মজুরদের শ্রমে, তিন বছর ধরে। এর নিচে ৪৬,৭০০ যুদ্ধ-নিহতদের সমাধি।

অদূরে এক গ্যালারির মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রের বিরাট বিস্ময়কর এক প্রাচীরচিত্র—গোলাকৃতি ঘরের সমস্ত দেয়াল জুড়ে এঁকেছেন এক ফরাসী শিল্পী। ছবির সামনে ঘোড়া এবং মানুষের মৃত্তিকা-মূর্তি কিছু কিছু সাজানো আছে, কিন্তু ধরা প্রায় অসম্ভব কোনটা মূর্তি আর কোনটা ছবি। তেমনি দিগন্তের দিকে তাকালে কিছুতে বিশ্বাস হতে চায় না যে ও জায়গার থেকে মাত্র চৌদ্দ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছি!

ব্রাসেল্‌স শহরের প্রধান রাজপথের নিচে বয়ে গেছে এক নদী, আগে নাকি জায়গাটা খোলা ছিল। যুদ্ধের পরে মার্কিন প্রেসিডেণ্টের সম্মানে এরা আরেকটি রাজপথের নামকরণ করেছে বুলেভার ফ্রাংক্‌লিন রুজভেল্ট। ভারতীয় দূতাবাসের অবস্থান এখানে। শান্ত অভিজাত পল্লী, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য সুদৃশ্য অট্টালিকার সারি, দোকানপাটের গোলমাল নেই বেশী। অদূরে প্যালেস অব জাস্টিস—উনবিংশ শতাব্দীর অট্টালিকার মধ্যে য়োরোপে সর্ববৃহৎ, বহুবিধ স্থাপত্যধারার সংমিশ্রণের জন্য বিখ্যাত। ব্রাসেল্‌সের লেস বিশ্ববিশ্রুত। এই কুটির-শিল্পের এক প্রতিষ্ঠানের ভিতরে গিয়ে দেখবার সুযোগ হয়েছিল কর্মরত মেয়েদের নিপুণ পারদর্শিতা। লেস-শিল্পের মধ্যে যে এত বিচিত্র সৌন্দর্য ও কারুকাজ আছে তা আগে জানতাম না।

সুইৎসার্লাণ্ড

অতঃপর স্বপ্নরাজ্য সুইৎসার্লাণ্ড। ঠিক সীমান্তের অভ্যন্তরে বাস্‌ল (Baslc) শহর, তাই লক্ষ করে এক সন্ধ্যায় ব্রাসেল্‌স থেকে ট্রেনে উঠলাম। আগামী কাল বিকেলে পৌঁছাব। ট্রেন আসছে ইংলিশ চ্যানেলের বন্দর থেকে, শোবার জায়গা তো দূরস্থান, বসতে পাব এমন আশা ছিল না। ভাগ্যক্রমে অনেক লোক নেমে যাওয়াতে স্থান জুটল। কামরায় মুখো-মুখি চার জন করে আট ব্যক্তির বসবার জায়গা।

সকালবেলা ঘুম ভাঙল আমার সবচেয়ে আগে। ততক্ষণে গাড়ী চলেছে লুক্সেমবুর্গ দেশের উন্মুক্ত পল্লীপ্রান্তরের মধ্য দিয়ে। উঠে প্রাতঃকৃত্য সব শেষ করে নিলাম,—গোটাআষ্টেক কামরার জন্য একটি কল-পায়খানা, পরে ও জায়গাটার কী অবস্থা হবে বলা যায় না। গাড়ি ফরাসীদেশে ঢুকল। রেস্তরাঁ-কামরায় প্রাতরাশ সেরে আসার পর সহযাত্রীদের সঙ্গে অল্পস্বল্প আলাপ শুরু হল—ভাষার বাধা এড়িয়ে যতটা সম্ভব। কেউ চলেছে ব্যবসার কাজে, কেউ আত্মীয়জনের সঙ্গে দেখা করতে।

আমাদের মত দেশ দেখতে যাচ্ছে শুধু একটি তরুণী। তার দেশ কোথায় ঠিক বোঝা গেল না, এক অক্ষরও ইংরেজী জানে না সে। কিন্তু আমরাও বেড়াতে বেরিয়েছি জেনে অদম্য উৎসাহ তার আলাপ জমাবার; 'প্যানামেরিকানো' শব্দটার সাহায্যে এবং আঙুল দিয়ে শূন্যে গোটাকয়েক বৃত্ত রচনা করে সে বোঝালে যে আকাশযানে পৃথিবীর অনেক জায়গা ঘুরেছে সে।

বাস্‌ল ছোট্ট, পরিষ্কার, বিশেষত্ববর্জিত শহর। দোকানভর্তি ঘড়ি কলম ক্যামেরা টাইপরাইটার পোশাক পরিচ্ছদ, ইত্যাদি; মার্কিন এবং অন্যান্য দেশের বহুবিধ পণ্য। সওদা করার পক্ষে য়োরোপের শ্রেষ্ঠ বাজার সুইৎসার্লাণ্ড। এদের নেই ডলারের অভাব এবং নিজেরাই এরা বানায় অনেক বিলাসের সামগ্রী। কিন্তু আমাদের মত ইংলণ্ড থেকে যারা আসে তাদের ভাগ্যে এদের মুদ্রা অর্থাৎ সুইস্‌ ফ্রাংক নির্ধারিত থাকে সামান্যই; হোটেলের খরচ বাদ দিলে তার বেশী কিছু আর বাকি থাকে না। সুতরাং দোকানের জানলার সামনে শুধু প্রদর্শনী দেখার মত ঘুরে ঘুরে বেড়াই, কিছু ছোঁয়া যেন নিষিদ্ধ।

পরদিন সকালে বৈদ্যুতিক ট্রেনে দু ঘণ্টার মধ্যে লুসার্ন শহরে আসা গেল। লুসার্ন ঝকঝকে বড় শহর, কিন্তু ব্রাসেল্‌স বা প্যারিসের মত অতি আধুনিক নিওন-নাইলন সভ্যতার

ও ব্যস্ততার লীলাক্ষেত্র নয়। এখানে মন বিশ্রাম পায়, চোখ জুড়ায়। স্থানে স্থানে দৃশ্য অতি মনোরম। সুদীর্ঘ লুসার্ন হ্রদ শহর দ্বিভক্ত করেছে, গুটিকয়েক সুচারু সেতু বেঁধেছে তার এপার ওপার। নানারকমের খেয়া পারাপার করছে, ভ্রমণার্থীদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। হ্রদের কূল ধরে চলে গেছে প্রশস্ত বিহারপথ বা প্রমেনাদ, তার একদিকে গাছের ছায়ায় ছায়ায় ঘাসের উপর বেঞ্চি পাতা, অন্য পাশে অভিজাত হোটেল এবং অট্টালিকার সারি। সারা পৃথিবীর বহু ধনীর বিহারক্ষেত্র শহরের এই অংশ ; তাদের মধ্যে কয়েকটি ভারতীয় নরনারীও চোখে পড়ল। এ শহরে পথের মোড়ে মোড়ে ফোয়ারার ছড়াছড়ি এবং—সবচেয়ে বড় আকর্ষণ—সর্বত্র চোখে পড়ে দূরে তুষারাবৃত গম্ভীর পর্বতমালার শুভ্রমূর্তি ; যেন সাদা কাগজ ভাঁজ করে সাজানো। এখান থেকে মাত্র দু ঘণ্টা দূরে পর্যটকদের প্রসিদ্ধ তীর্থ—দুই হ্রদের মিলনক্ষেত্র—ইণ্টারলাকেন (Interlaken)। পরদিন দুপুরের আগে স্টেশনের রেস্তরাঁ থেকে লাঞ্চ বাস্কেট কিনে নিয়ে ট্রেনে চড়লাম। লাঞ্চের চেহারা দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না কেন এদেশের প্রায় প্রত্যেকটি পুরুষ মেয়ের এমন সুন্দর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা, কেন এরা এতখানি সাবলীল দৈহিক শক্তি এবং লাবণ্যের অধিকারী। দেহের পুষ্টির জন্য যে জিনিস যতটুকু প্রয়োজন, সুস্বাদু ভোজ্যের

মধ্য দিয়ে তার সবই আছে ঐটুকু বাক্সের মধ্যে। মহাযুদ্ধের দানব এদের ভাঁড়ারে কিছুমাত্র দাঁত বসাতে পেরেছে বলে মনে হয় না।

ট্রেনের গাড়ির উপাদান তৈরি হয়েছে কয়েকটি ধাতুর সংযোগে, যাতে শক্তির ক্ষতি না করে ভার কমানো সম্ভব হয়েছে অনেকখানি। সেজন্য গাড়ি চলে দ্রুত এবং ধাতু-উজ্জ্বল অভ্যন্তর মন প্রসন্ন রাখে। জানলার পাশে বসে বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে রাস্তা যে কোথা দিয়ে ফুরিয়ে গেল টের পেলাম না। নিরন্তর পরিবর্তনশীল বিমুগ্ধকর দৃশ্যপট। সুদীর্ঘ সুনীল হ্রদশ্রেণী এদিকে প্রায় রেলের লাইন ছুঁয়েছে, ওপারে সীমাহীন পর্বতমালার তলদেশ ঘিরে ঘিরে দূর-দূরান্তরে বিস্তৃত। শান্ত স্বচ্ছ জলে ছায়া ফেলে লঘু সাদা মেঘ পালকের মত ভেসে বেড়াচ্ছে পাহাড়ের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে। উপত্যকায় ছোট ছোট ঘুমন্ত গ্রাম,—লাল-সাদা ঘরবাড়ি, গির্জার চূড়া ইত্যাদি ছবির মত পরিপাটি ; বুনো ফুলে ছাওয়া ঢেউখেলানো মাঠ। কিছু পরপরই দুটি একটি ঝর্ণাধারা পাহাড়ের কোল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে অনেক নিচে, যেন সাদা শাড়ি উড়িয়ে। এসব ছাড়া পাহাড়ের সারাদেহ পাইন-জাতীয় গাছের বনে ঢাকা। অল্প কুয়াশার আড়ালে উত্তুঙ্গ শীর্ষদেশ মনে হয় যেন আরো দুর্গম, আরো সুদূর—কেমন এক

রাজসিক গাম্ভীর্যে সমাচ্ছন্ন। দেখনে দেখতে হঠাৎ বৃষ্টি এল এক পশলা, জানলার ওপাশে বাতাসের বেগে তাড়িয়ে নিচ্ছে সূক্ষ্ম ফোঁটাগুলি; এই আবছা পর্দার আড়ালে বিস্তীর্ণ হ্রদ, অনেক দূরে একটি ছোট্ট নৌকা ইত্যাদি হঠাৎ এক রহস্যময় নতুন রূপে দেখা দিল। আরো দূরে ধূসর পর্বতশ্রেণীর সীমা-রেখা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। যেন পাতলা ঘোমটায় প্রকৃতি মুখখানি ঢাকলে তার, মুগ্ধ করলে নতুন করে।

বাকি দিনটা খেয়ালী বৃষ্টির মধ্যেই কাটল। ইণ্টারলাকেন ক্ষুদ্র শহর, অধিকাংশই তার হোটেল এবং দোকান। খেয়া-নৌকা ভাড়া করে হ্রদে বেড়ানো, স্নান ইত্যাদি অন্যতম আকর্ষণ। অনেক বিদেশী স্বাস্থ্যান্বেষী এখানে নিরিবিলিতে কাটাচ্ছে তাদের দিন।

কিছু কিছু সওদা করে অতঃপর এক ফিটন গাড়ি ভাড়া করা গেল। কোচোয়ান বৃদ্ধ ব্যক্তি, ঢিমে তেতালা চালে চলেছে। ঘোড়াটারও গায়ে বেশী জোর আছে মনে হয় না। অবশেষে স্টেশনে পৌঁছালাম; ঘোড়াকে খেতে দিয়ে কোচোয়ান আমাদের সঙ্গে গল্প জুড়লে। সাদাসিধে পাড়াগেঁয়ে লোক। সিগারেট পেয়ে একগাল হেসে বললে "Danke schön" (অনেক ধন্যবাদ), তারপর আমাদের দেশের কথা অনেক জিজ্ঞাসা করলে। বললাম, "তোমার গাড়ির মত গাড়ি আমাদেরও

অনেক আছে।" শুনে সে অবাক। কিন্তু এ তথ্য অনেক চেষ্টায় যদিওবা তাকে বিশ্বাস করানো গেল, তার ঘোড়ার চেয়ে ভাল ঘোড়া যে ভারতবর্ষে থাকতে পারে এ কথা সে কিছুতে মানতে রাজি হল না।

এদেশে আল্‌প্‌স গিরিশ্রেণীর এক প্রসিদ্ধ শিখর য়ুংফ্রাউ (Jungfrau—অর্থ তরুণী), উচ্চতা তার ১২,০০০ ফুট। ইণ্টারলাকেন থেকে তার শুভ্রোজ্জ্বল মূর্তি অতি সুন্দর দেখা যায়। উপরে আছে ভাল সরাইখানা, খেলাধুলা ও আরামের সর্ববিধ সুব্যবস্থা; রেলপথে চড়া যায়।

ইণ্টারলাকেনের কাছে মেইরিঞ্জেন (Meiringen) নামে এক ছোট জায়গা, সেখান থেকে ডাকবিভাগের বাস পার্বত্যপথে নানাদিকে যায়, যাত্রী সঙ্গে নেয় তারা। একটি বাস সকাল নটায় ছাড়ে,—গ্রিমসেল, ফুর্কা, গট্‌হার্ড, সুস্টেন ইত্যাদি নামের নানা জায়গা ঘুরে বিকেল সাড়েপাঁচটায় ফিরে আসে। খোঁজ-খবরে জানা গেল এখানে এই ভ্রমণচক্রই সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক, সুইৎসার্লাণ্ডের নিজস্ব এবং বিখ্যাত প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্যের অন্তর উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এ পথে। এ কথা মানতে কষ্ট হয়নি পরে।

নটার অনেক আগেই গিয়ে হাজির হয়েছি বাস স্টেশনে। অপেক্ষা করতে করতে সভয়ে লক্ষ করলাম যাত্রীর ভীড় বেশ

বেড়ে গেল—সকলে কখনো জায়গা পাবে না। অবশেষে লোক নেওয়া শুরু হল ; ডাকবিভাগের এক কর্মচারী তালিকার থেকে ডেকে ডেকে নাম পড়ছে আর এক একজন করে লোক ঢুকছে বাসে। এরা সব পূর্বাহ্ণে জায়গা রিজার্ভ করেছে বুঝতে পেরে মনে আশা নিতান্তই ক্ষীণ হয়ে এল। নাম পড়া শেষ হয়ে গেল, বাসও বুঝি ভর্তি, এমন সময় লোকটি বললে, "আর ছুটি মাত্র জায়গা আছে, কে যেতে চাও ?" অনেকের সঙ্গে আমরাও হাত তুললাম ; সবার উপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মৃদু হেসে সে আমাদেরই ডাকলে—কী বিচারে জানি না, বোধ হয় দূরদেশের অতিথির প্রতি সহৃদয়তার বশে। ভারত-সুইস্ আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি এতে. গভীরতর হল সন্দেহ নেই—অন্তত আমাদের মনে।

বাস চড়তে শুরু করলে সর্পাকৃতি পাহাড়ী রাস্তা ধরে। রাস্তা খুব প্রশস্ত নয় কিন্তু মজবুত। একদিকে খাড়া পাহাড়ের দেয়াল, অন্যদিকে খাদ ক্রমশ গভীর হচ্ছে। পথের মোড়ে কোথাও কোথাও আছে সতর্কবাণী,—আকস্মিক দুর্ঘটনায় যারা প্রাণ হারিয়েছে তাদের ইতিহাস। নিচের দিকে তাকালে পিছনের পথটা দেখায় যেন কারো খেয়ালে এলোমেলো ছড়ানো একটা অন্তহীন সাদা ফিতের মত। বাস মাঝে মাঝে দাঁড়াচ্ছে কয়েক মিনিটের জন্য ; নেমে হাত পা সোজা করে নিচ্ছি, কেউ

ছবি তুলছে। চড়াইয়ের সঙ্গে সঙ্গে টের পাচ্ছি শীতও বেশ বাড়ছে।

সহযাত্রীদের প্রায় সবাই বিদেশী পর্যটক। কত বহু বছরের আকাঙ্ক্ষা হয়তো চরিতার্থ করতে এসেছে। মনে পড়ে এক ইংরেজ দম্পতি ; বয়সে প্রৌঢ়, চেহারায় এবং আলাপে নিম্ন মধ্যবিত্ত সংসারের যাবতীয় ঝড়ঝাপটার চিহ্ন। একটি মিষ্টভাষী সুরসিকা বেলজিয়ান তরুণী ছিল ; কোন এক আপিশে কাজ করে, এখন তার যা কিছু সঞ্চয় সব খোয়াবার জন্য বেরিয়ে পড়েছে দূরদূরান্তের পথে।

সুইৎসার্লাণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ইতিপূর্বে উচ্ছ্বসিত বাক্যবিন্যাসে এবং মনোরম ফোটোগ্রাফ সহযোগে বাংলাভাষায় বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এ প্রসঙ্গ এখানে আর বেশী না বাড়ালেও চলবে। শুধুমাত্র সুইস্ সৌন্দর্যের দুটি বিশেষত্বের উল্লেখ করা হয়তো বাহুল্য হবে না। তা হল দৃশ্যপটের বৈচিত্র্য এবং পরিপ্রেক্ষিতের বিশালতা। আমাদের দার্জিলিং অথবা বিলেতের উত্তর ওএল্‌স এইখানেই হার মানে এদেশের কাছে। এখানে প্রকৃতি প্রতি মুহূর্তে এক একটি নতুন পৃষ্ঠা মেলে ধরছে —বৈচিত্র্যে সৌন্দর্যে গাম্ভীর্যে যার তুলনা মেলে না। পাহাড় কোথাও উঠেছে সোজা আকাশ ভেদ করে উদ্ধত ভঙ্গিতে—যেমন সূচ্যগ্র মাটারহর্ন (Matterhorn) শৃঙ্গে—কোথাওবা চলেছে

মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে ; কারো দেহ ঘন নীল পাইন বনে আচ্ছাদিত, কেউবা ফিকে সবুজ ঘাসে ঢাকা, কোথাও আবার খালি রুক্ষ উন্মুক্ত পাথর। পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় চোখ-ঝলসানো সাদা বরফের মুকুট, সূর্যের আলোয় এখানে ওখানে চঞ্চল সোনালী আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে, যেন অসংখ্য হীরকখণ্ডের থেকে। প্রতি পদে পদে ঝর্ণা আর ঝোরার লুকোচুরি, কানাকানি। হাণ্ডেগ-এ (Handegg) দুটি বিশাল ঝর্ণার সঙ্গমে সৃষ্টি হয়েছে এক বিস্ময়কর, ভয়াবহ দৃশ্য। সবচেয়ে চমকপ্রদ আশ্চর্য বস্তু বোধ-হয় বরফের চাদর বা গ্লেসিয়ার ; গলন্ত তুষার-স্তর গিরিশৃঙ্গ থেকে নামতে নামতে আবার জমে গেছে—মনে হয় প্রকাণ্ড এক ঝর্ণা যেন কার মন্ত্রে হঠাৎ স্থির হয়ে গেছে···নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের বিপরীত। তার সারাদেহে সাদা আর ফিকে নীলের চাকচিক্য। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত রোন (Rhone) গ্লেসিয়ার। স্থানে স্থানে তার দোতলার মত উঁচু অসমান তুষার স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে কোনো অতিকায় জন্তুর দন্তবিস্তারের মত। বরফ ভেদ করে এক সুরঙ্গ কাটা হয়েছে, সামান্য কিছু পয়সা দিয়ে ঢোকা যায় ভিতরে। সবুজ, নীল আর সাদার সে এক আশ্চর্য মায়াকক্ষ।

আমাদের এই ভ্রমণচক্রের সবচেয়ে উঁচু স্টেশন ফুর্কা (Furka)—৬,০০০ ফুট। জুলাই মাসেও কনকনে শীত, কিন্তু

সরাইখানার উষ্ণ অভ্যন্তরে আরামে লাঞ্চ সারা গেল। তারপর আবার নিচের দিকে, এবার ভিন্ন রাস্তায়। পথে পড়ল সুপ্রসিদ্ধ সেইন্ট গট্‌হার্ড (Saint Gotthard) সুরঙ্গ। দশ মাইল দীর্ঘ এই সুরঙ্গ পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছে রেলপথে ইটালির সঙ্গে যোগ স্থাপনের জন্য। মাঝে মাঝে উপত্যকার খেত-খামারের মধ্য দিয়ে বাস চলছিল। পাহাড়ের ঢালু গায়ে এদের বিখ্যাত শালে (chalet) বা গ্রাম্য কুটির সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে ; এই বাসা-বাড়ির পিছনের নিম্নাংশ অনেকখানি ভূগর্ভে নিমজ্জিত হওয়াতে এক অভিনব ভঙ্গিমার সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাকৃতিক সম্পদ সুইৎসার্লাণ্ডের আর্থিক সম্পদের সবচেয়ে বড় রসদ। ভারতবর্ষের নানা অংশে স্বাভাবিক সৌন্দর্য পর্যটকের লোভ জাগায়, কিন্তু যতদিন না আমরা রেল ও মোটর-পথ, বাস-ব্যবস্থা ইত্যাদির উন্নতি করতে পারছি ততদিন টুরিস্ট-ব্যবসা সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করে বেশী কিছু লাভ হবে বলে মনে হয় না।

ইটালি

একদিন বেলা ছটোয় লুসার্ন থেকে ট্রেন ধরলাম দক্ষিণাভিমুখে, ইটালি লক্ষ করে। সেইন্ট গট্‌হার্ড স্নুরঙ্গ অতিক্রম করতে সময় লাগল বারো মিনিট। বিখ্যাত লুগানো হ্রদ (Lake Lugano) পর্বতমালার ভিতরে এঁকে বেঁকে অনেকক্ষণ চলল সঙ্গে সঙ্গে। ছটায় ইটালি-সীমান্তের ঠিক অভ্যন্তরে ওদের শুল্কবিভাগের লোক গাড়িতে উঠে যাত্রীদের মালপত্র পরীক্ষা করলে। জায়গার নাম কিয়াসো (Chiasso)। তার পর থেকে দৃশ্যপটের পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। পাহাড় হ্রদ ইত্যাদির পরিবর্তে চোখে পড়ে অধিকাংশই উন্মুক্ত প্রান্তর, বড়-জোর ছোট ছোট টিলা। ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট আর নয় ছবির মত পরিষ্কার, সুন্দর। আমাদের দেশের মত বারান্দাওলা ঢালা-ছাত বাড়ি এবং কিছু কিছু বস্তিও চোখে পড়ল।

সেটা ছিল সপ্তাহের শেষ। এ গাড়ি মিলান হয়ে সমুদ্র-তীরে যাবে। প্রতি স্টেশনে কিছু কিছু ইটালীয় যাত্রী গাড়িতে উঠছে; অবশেষে বারান্দায় এবং কামরার ভিতরে পর্যন্ত তিল

ধারণের জায়গা রইল না। অনেকে মিলান থেকে কয়েক স্টেশন পিছিয়ে এসে গাড়ি ধরেছে—সেখান থেকে উঠতে পারবে না এই ভয়ে। দেখে শুনে আমাদের মনে কিঞ্চিৎ দুর্ভাবনার সঞ্চার হল—মালপত্র নিয়ে নামব কি করে! দুটি ভদ্রলোক আমাদের জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলেন আমরা মিলানের যাত্রী, তারপর ঠেলেঠুলে ঠিক মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন যাতে আমরা উঠলেই জায়গা দখল করতে পারেন। অবশেষে সন্ধ্যা আটটায় মিলান স্টেশনে গাড়ি ঢুকল। প্লাটফর্ম লোকে লোকারণ্য—ঠেলাঠেলি চীৎকার ছুটোছুটি ইত্যাদির মধ্যে সম্পূর্ণ বাঁধনছাড়া জনতার এক দিশেহারা মূর্তি। দরজা দিয়ে আসা-যাওয়া অসম্ভব; গাড়ি থামবার আগেই মালপত্র নিয়ে লোকে ঢুকে পড়ছে জানলা দিয়ে; চক্ষের নিমেষে দেখি গাড়িতে গাদাগাদি সার্ডিনের টিনের মত।

কোনোপ্রকারে নিজেদের নিষ্ক্রান্ত করে প্লাটফর্মের বাইরে আসা গেল। বুঝলাম এদেশে বেড়াতে হবে অনেকটা ভারতবর্ষের মতই কষ্ট করে,—এযাবৎ যে নির্ঝঞ্ঝাট আরামে গায়ে ফুঁ দিয়ে ট্রেনে চলাচল করেছি তা ভুলতে হবে কিছুদিনের জন্য। লোকজন ইতিমধ্যে যা চোখে পড়েছে তাদের অনেকের চেহারাতেও সাদৃশ্য আছে আমাদের সঙ্গে; কালো চুল, কালো

চোখ ; গায়ের রং কারো প্রায় আমাদের ফর্সা লোকের মত ; কারো গালে দুদিনের দাড়ি।

আমাদের তখন সর্বাগ্রে দরকার ইটালীয় টাকা। লণ্ডন থেকে সব দেশের মুদ্রা কিছু কিছু সঙ্গে এনেছিলাম, শুধু ইটালির ছাড়া। কারণ এখানে পাউণ্ডের দাম অত্যন্ত বেশী—দুহাজার লিরা পথেঘাটে পাওয়া যায়, কিন্তু সরকারী হারে মাত্র নশো লিরা। সুতরাং, পাউণ্ড বা ডলার থেকে লিরা করতে ব্যাঙ্কে যায় না কোনো মূর্খ। কিন্তু এই রাতে মুদ্রা ব্যবসায়ী পাই কোথায় ভাবছি এমন সময় হঠাৎ একটি লোক এসে আলাপ করলে। আমাদের চিনতে পেরেছে ভারতীয় বলে কারণ যুদ্ধের মধ্যে অনেকদিন বন্দীবাসে কেটেছে সেদেশে। চেক ভাঙাবার লোক সেই জুটিয়ে দিলে,—দেখলাম এর মধ্যে লুকোচুরি কিছুই নেই, পুলিশে দেখেও দেখে না।

মিলান স্টেশন গৃহের স্থাপত্য বিখ্যাত—জগতের সবচেয়ে সুদৃশ্য রেলস্টেশন বলে নাম আছে। বোমাবর্ষণে ভিতর দিকের ছাত কিছু কিছু ভেঙে গেছে, কিন্তু বহির্দৃশ্য এখনো সত্যিই দেখবার মত। প্রকাণ্ড সুউচ্চ স্তম্ভশ্রেণীর উপর রক্ষিত বিশাল সম্মুখভাগ 'Roman grandeur' মনে করিয়ে দেয়। যেন কোনো মিউজিয়াম, রেলস্টেশন নয়। সামনে প্রশস্ত উদ্যান।

কাছেই এক হোটেলে আশ্রয় নিলাম। শয্যা ও প্রাতরাশের মূল্য জনপ্রতি বারো শিলিং একটু বেশীই মনে হল, ঘরও এমন কিছু ভাল নয়। খিদেয় পেট জ্বলছে। হোটেলের ম্যানেজার আমাদের খেতে দিতে পারলেন না, কিন্তু কাছেই এক রেস্তরাঁতে ব্যবস্থা করে দিলেন। উন্মুক্ত আকাশের নিচে ফুটপাথের উপর বসলাম খেতে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, ইটালিতে এসে গরমও যেন টের পাচ্ছি বেশী। বাইরে বসে পরিবেশনকারী লোকটির সঙ্গে গল্প করতে করতে খেতে বেশ লাগছিল, শুধু মাঝে মাঝে ভিখারীরা এসে বিরক্ত করে। শেষে কিন্তু খাবারের দাম দেখে আমাদের চোখ উঠল কপালে—মাথাপিছু প্রায় বারো শিলিং ; খেয়েছি শুধু 'নুড্‌ল্‌স', বীন সহযোগে 'স্টেক', একটি পীচ ও একগ্লাস বীয়ার। আমাদের সঙ্গে অত টাকাও ছিল না। অবশেষে আবার হোটেল ম্যানেজারের শরণাপন্ন হতে হল, দেখেশুনে তিনি তো ভীষণ চটে গিয়ে খুব করে বকলেন রেস্তরাঁর মালিককে এবং লিরা ধার দিয়ে উদ্ধার করলেন আমাদের। ইটালির কালোবাজার এবং দস্তুরদস্তুরী দোকানদারির কথা শুনেছিলাম আগেই, বুঝলাম এক্ষেত্রেও সাবধান হতে হবে নিজেদের দেশের মত।

দেশের কথা আবার মনে পড়ল যখন সেরাতে বজ্রপাত ও

মেঘগর্জনের সঙ্গে আকাশ ভেঙে নামল বৃষ্টি। য়োরোপে এমন মুষলধারে বারিপাতের অভিজ্ঞতা আর হয়নি। বৃষ্টির পরে গরমও বাড়ল বেশ।

পরদিন সকালে পরিষ্কার রোদ উঠল। প্রথমেই গেলাম মিলানের জগতবিখ্যাত ডুয়োমো (Duomo) বা ক্যাথিড্রাল দেখতে। এই বিশাল উপাসনা-মন্দিরের বহিরাংশে বিচিত্র কারুকার্য। অন্ধকারাচ্ছন্ন ধ্যানগম্ভীর অভ্যন্তরে বহু লোক প্রার্থনায় রত। কেউ একাকী এক কোণে কোনো মহাত্মার (Saint) মূর্তির সামনে নতজানু নিমিলিতনেত্র।

অদূরে শহরের কেন্দ্র, সেখানে ভিক্টর ইমানুএল গ্যালারি। উঁচু কাঁচের ছাঁতের নিচে পথ, তার দুধারে নানাবিধ দোকান এবং কাফের সারি। লোকে গমগম করে সর্বদা এজায়গাটা। কেউ বসে কফি খাচ্ছে, অনেকে আড্ডা জমিয়েছে। কেউ আছে কালোবাজারী ব্যবসার উদ্দেশে পর্যটকদের খোঁজে শ্যেনদৃষ্টি মেলে; আমাদের দেখে পাউণ্ড ভাঙিয়ে দিতে চাইলে, কিনতে চাইলে বিলিতি সিগারেট বা হাতের ঘড়ি, কেউ বেচতে চাইলে ইটালীয় পোশাক পরিচ্ছদ 'সস্তা' দামে। অন্যান্য দেশের মত এদেশেও অবশ্য ডলার এবং মার্কিন সিগারেটের একচ্ছত্র রাজত্ব; তার পরেই পাউণ্ড—বিশেষ করে 'ট্রাভলার্স চেক'; ২,০০০ লিরা দিয়ে পাউণ্ডের চেক এরা কিনছে এবং শুনলাম সেগুলি

নাকি বিক্রি করে ২,৮০০ লিরায়। সরকারী হার ৯০০ লিরা, আগেই বলেছি। মুদ্রা-স্ফীতির চূড়ান্ত!

মিলান শহরের আরেকটি জগতবিখ্যাত প্রতিষ্ঠান লা স্কালা (La Scala)—পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অপেরা গৃহ। টস্কানিনি এখানে নিজের খ্যাতি গড়ে তুলেছিলেন, এখনো মাঝে মাঝে ফিরে আসেন আমেরিকার থেকে। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তখন অনুষ্ঠান বন্ধ, সুতরাং বহির্দৃশ্য দেখেই ফিরে আসতে হল। সেখানে অসাধারণত্ব কিছু চোখে পড়ল না।

লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি তাঁর বিখ্যাত চিত্র 'দি লাস্ট সাপার' (The Last Supper) এঁকেছিলেন এ শহরের এক ক্ষুদ্র মন্দিরের আভ্যন্তরীণ দেয়ালে। দেয়ালের আর্দ্রতার দোষে ছবি এখন ধ্বংশোন্মুখ। ট্রামে ও পদব্রজে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে অবশেষে খুঁজে বার করলাম সেই চার্চ (নাম Santa Maria delle Grazie বা St. Mary of the Graces), কিন্তু এখানেও দরজায় তালা,—ভিতরে সংশোধনের কাজ চলছে বলে দর্শকদের প্রবেশ বন্ধ।

ইটালির প্রায় সব শহর রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংশে বা রেনেসাঁস যুগের চিত্র ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের নিদর্শনে সমৃদ্ধ। এদিক থেকে মিলান কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। বর্তমানে কল-কারখানা ও শ্রমশিল্পের এক বড় ঘাঁটি এ জায়গা, কমিউনিস্ট

প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়। মুসোলিনিকে হত্যা করে এরা শহরের কেন্দ্রে ঝুলিয়ে রেখেছিল কিছুদিন। পথেঘাটে নতুন ও পুরাতনের অদ্ভুত সংমিশ্রণ; বনিয়াদি অঞ্চলের বাড়িগুলিতে বিগত যুগের ছাপ, আমাদের চিৎপুরের রাস্তা মনে পড়ে। সংকীর্ণ নোংরা পথের কাছাকাছিই আবার এমন তুএকটি রাজপথ চোখে পড়ল সমগ্র য়োরোপে যার তুলনা মেলা ভার। পিয়াস্সালে ফিউমে (Piazzale Fiume) অত্যন্ত প্রশস্ত ও সুদৃশ্য রাজপথ, গাছে ঢাকা তিনচারটি ফুটপাথ তার মধ্যে, তুপাশে সুসজ্জিত বিপণিশ্রেণী এবং দশবারো তলা উঁচু বহু নতুন ফ্ল্যাটবাড়ি। আধুনিক মিলানের এসব অংশ গড়ে উঠেছে মুসোলিনির প্রভুত্বকালে।

এরপর একদিন বিকেলে ভেনিসের গাড়ি ধরলাম। বসবার জায়গা জুটল না ঘণ্টাকয়েক, করিডরে দাঁড়িয়ে থাকতে হল। তৃতীয় শ্রেণীর কামরাগুলিতে আরো প্রচণ্ড ভীড় এবং অবস্থা ভারতবর্ষের মতই ভয়াবহ; উন্মুক্ত কাঠের বেঞ্চি, নোংরা লোকের ঠেলাঠেলি গালাগালি। মায়েরা তারই মধ্যে বসে গেছে শিশুদের স্তন্য দিতে। গরমে লোকের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

পঁচাত্তর মিনিট দেরি করে গাড়ি ছাড়ল। অধিকাংশই উন্মুক্ত সমভূমির মধ্য দিয়ে চলেছি, কিছু উত্তরদিকে দূরে পর্বতরেখা চোখে পড়ছে। পথে পড়ল তুই বড় শহর, ভেরোনা এবং

পাহুয়া ; ভেরোনার একটু আগে সুবৃহৎ হ্রদ গার্দা (Garda)। ইতিমধ্যে বসবার জায়গা পেয়েছি, সহযাত্রীদের সঙ্গে অল্পস্বল্প আলাপ শুরু হল। একটি সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ বসেছেন মুখোমুখি,—ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, মাথার চুল সব সাদা। ভারতীয় নেতাদের মধ্যে গান্ধীর নাম শুনেছেন বটে, কিন্তু সবচেয়ে ভক্তির পাত্র তাঁর 'চন্দ্র বোস' (সুভাষ)। ভাঙা ভাঙা ইংরেজী জানেন,—আমরা তাঁদের দেশ দেখতে এসেছি শুনে নানারকম তথ্য সরবরাহ করে সাহায্য করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। চোখে ভাল দেখতে পান না, কিন্তু টাইম টেবল খুলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরের জঙ্গল থেকে খুঁজে বার করবেনই কোথায় কোন ট্রেন আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক হবে।···দেশ দেখা এবং ভ্রমণের মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক তথ্য শেখা যায়, বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য মন মুগ্ধ করে, কিন্তু দেশে দেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে মাঝে মাঝে যে সহজ মানবিকতার পরিচয় মেলে তাতে নিজের মনুষ্যজন্মের প্রতি শ্রদ্ধা হয়। এই সত্যের অনুভূতিতে মন প্রসন্ন হয় যে বিশ্বমানবের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক ঔদার্য জাতিধর্মের ব্যবধানের চেয়ে অনেক বেশী শাশ্বত এবং এরই শক্তি হয়তো পরিশেষে মানুষকে উদ্ধার করবে বহুবিধ সংকীর্ণতা ও অসত্যের সর্বনাশ থেকে।

নটার সময় ভেনিসের আলো দেখতে পাওয়া গেল।

তখন সবে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। লাইনের নিচে জলাভূমি, তারপর ছদিকে খালি জল, সরু সুদীর্ঘ সেতুর উপর দিয়ে গাড়ি চলেছে। পিছনে এক লাল আলোর নিশানা জ্বলছে আর নিভছে, ভেনিস পৌঁছাতে পৌঁছাতে তা মিলিয়ে গেল দূরে।

স্টেশন থেকে বেরিয়েই সামনে শহরের প্রধান প্রণালী বা 'গ্রাণ্ড কানাল' (Grand Canal)। জল-নগরীর সবচেয়ে বড় রাজপথ। বাঁদিকে এক ভীড়াক্রান্ত রাস্তা, সেখানে অনেক হোটেল মেলা উচিত। নাতিপ্রশস্ত নাতিপরিচ্ছন্ন পথে ঠেলা-ঠেলি করে চলেছি। নানারকমের নরনারী,—বিশেষ করে চোখে পড়ে কোলাহলরত মার্কিন সৈনিক এবং তাদের রং-মাখা সহচরী। হোটেল পদে পদে, কিন্তু স্থান-সংকোচ সর্বত্র। ভেনিস যে য়োরোপের এক প্রধান প্রমোদকেন্দ্র তা টের পেলাম, যদিও শেষপর্যন্ত বুঝতে পারিনি কী কারণে!

অবশেষে এক হোটেলের সামনে মালপত্র আগলে দাঁড়িয়ে আছি, বন্ধু এসে জানালে পাওয়া গেছে একখানি ঘর। ভিতরে ঢুকবার সময় হোটেলের কেরানী সুস্পষ্ট বিস্ময়ে তাকালে আমার দিকে—ছটি পুরুষ যে এক ঘর ভাড়া নেবে তা বোধহয় সে ভাবতেই পারেনি। এখানেও বিচিত্র লোকের সমাবেশ, অনেক সন্দেহজনক চরিত্র। জামাকাপড় বদলে ভিতর দিকের দোতলার ঢাকা বারান্দায় খাবার টেবিলে এসে বসলাম।

সামনের অঙ্গনে খোলা আকাশের নিচে চলচ্চিত্রের আসর জমেছে। দেখানো হচ্ছে ভাষান্তরিত এক মার্কিন ছবি—কার্মেন মিরাণ্ডা, অ্যালিস ফে, ডন অ্যামিচে সব ইটালীয় ভাষায় কথা-বার্তা বলছে। নিচের দর্শকরা বসেছে কাঠের বেঞ্চিতে,—অধিকাংশই বান্ধবী সমভিব্যাহারে শার্ট-পরা যুবকের দল। দেখতে দেখতে হঠাৎ বৃষ্টি এল ; মাত্র কয়েকটি উৎসাহী ছাড়া আর সবাই উঠে পালাল। বিনা পয়সার দর্শক আমরা অবশ্য নির্বিঘ্নে ছবি দেখতে থাকলাম, উপাদেয় খাদ্য পানীয়ের স্বাদ গ্রহণ করতে করতে।

অন্যান্য অনেক কিছুর মত, খাদ্য বিষয়েও য়োরোপের মধ্যে ইটালীয়দের বৈশিষ্ট্য ও বৈষম্য নজরে পড়ে। সুপের পরিবর্তে এরা সাধারণত আরম্ভ করে স্পাগেটি, ম্যাকারুনি, নুডল্‌স বা ভাত ইত্যাদি কোনো শ্বেতসার-প্রধান ভোজ্য দিয়ে। তারপর, পুডিং বা মিষ্টান্নের শেষে ফল এদের প্রায় অপরিহার্য। ফলের প্রাচুর্য এবং চরিত্র ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনীয়। দুপুরের বা রাতের খাওয়ার পরে কফি জনপ্রিয় নয় অন্যান্য য়োরোপীয় দেশের মত ; এদের ঘন, ফেনায়িত কফি খেতেও সম্পূর্ণ অন্য-রকম,—সুস্বাদু বলা যায় না। রান্নার ব্যাপারে অবশ্য এরা বিশেষ পারদর্শী ও স্বাদগ্রাহী।

ভেনিস শহরকে দ্বিভক্ত করেছে উপরোক্ত গ্রাণ্ড কানাল

এবং তার থেকে বহু সংকীর্ণ শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হয়েছে চতুর্দিকে। ঘন ঘন সেতু। পদব্রজে অবশ্য যে কোনো জায়গায় যাওয়া চলে কিন্তু বাহন একমাত্র জলযান। বাস ট্রামের মত স্টীমলঞ্চ ও মোটরলঞ্চ চলাফেরা করে ঘন ঘন—এক্সপ্রেস এবং প্যাসেঞ্জার দু রকম। এ ছাড়া ট্যাক্সির মত আছে অবশ্য গণ্ডোলা। গণ্ডোলা কারুকার্যখচিত নৌকা ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু জনপ্রবাদ নৌকা এবং তার মাঝিকে এমন এক স্বপ্নময় গৌরবে ভূষিত করেছে যে গণ্ডোলায় বেড়ানো সম্প্রতি বেশ পয়সা সাপেক্ষ। এ শহরে আধুনিকতা সামান্যই—দেখে শুনে কাশীর কথা মনে পড়ে। গ্রাণ্ড কানালের দুই তীরে প্রসিদ্ধ গৃহশ্রেণী ; বিংশ শতাব্দীর মাপকাঠিতে এগুলিকে প্রাসাদ বা অট্টালিকা বলা চলে না এবং অধিকাংশের মধ্যেই আমাদের বনিয়াদী জমিদারগৃহের মত সংস্কারের প্রয়োজন লক্ষণীয়। সদর দরজার থেকে যে সিঁড়ি এসে মিশেছে জলে তা এখন ঘন শেওলায় সবুজ। কিন্তু পুরাতন যুগের স্বাধীন ভেনিস রাজ্যে এই সব গৃহ গড়ে তুলেছিলেন সেকালের সমৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত পরিবার-মণ্ডলী ; বিলাসের ও উৎসবের আসর জমত এই খাল-পারের ঘরে ঘরে।

শহরে প্রধান আকর্ষণ পিয়াস্‌সা সান মার্কো (Piazza San Marco) ; এক বাঁধানো চতুষ্কোণ অঙ্গন, দোকানঘরে ঘেরা।

একপাশের গির্জা ও সুউচ্চ ঘড়ি-স্তম্ভ প্রথমেই বিস্ময় উদ্রেক করে। অবসর বিনোদনে বা বেড়াতে লোকে আসে এখানে। এক পাত্র চা নিয়ে বসলে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা এসে ফিসফিস করে বলে সুন্দরী সিনিয়রিনার খবর, লিরার ব্যবসায়ী আসে বিদেশী মুদ্রার খোঁজে, দোকানদারেরা বেরিয়ে পড়ে সাদর আমন্ত্রণ জানাতে। ভেনিসের কাঁচের কাজ জগতবিখ্যাত। এক বিক্রেতার উপরোধে যেতে হল তার সুবৃহৎ গুদামে,—কোন ভারতীয় মহারাজা তার কাছে কিনেছে কত লক্ষ টাকার মাল, আমাদেরও 'ইণ্ডিয়ান প্রিন্স' ঠাওরেছিল বোধহয় সে। ভিতরে ঢুকে এদের এই শিল্পের আশ্চর্য সূক্ষ্ম কারুকাজে মন মুগ্ধ হল, কিন্তু এ জিনিস না ভেঙে দেশ দেশান্তরে বয়ে বেড়ানো বোধহয় একমাত্র মহারাজাদের পক্ষেই সম্ভব। তবু অল্প কিছু কিনে আনবার লোভ সামলাতে পারলাম না।

চতুষ্কোণের আশেপাশে অসংখ্য সরু বিসপিল গলি, সে এক গোলকধাঁধার মত ব্যাপার। গলির দু পাশে বিচিত্র দোকানের হাট—অনেকটা আমাদের চাঁদনী বা মনোহরদাশ চক যেমন। বিবিধ লোভনীয় পণ্যসম্ভার,—কাঁচের জিনিস ও উৎকৃষ্ট কাপড় বা পোশাকের দ্রব্য-বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রেশম বা পশমবস্ত্রের শিল্পে ইটালীয় প্রতিভা সত্যিই বিস্ময়কর। জিনিস কিনতে গেলে সর্বত্র অবশ্য দরদস্তুরি চলে খুব; মার্কিন সেনাবাহিনীর

অবস্থানের ফলে বিদেশীর কাছে এরা প্রায়ই আশ্চর্য দর হাঁকে। সওদা করবার আগে দর শুনে আমরা প্রথমেই বলি troppo caro—অর্থাৎ, বেশী দাম!

পিয়াস্‌সা সান মার্কোর একপাশে একটি মিউজিয়াম—ডুকাল প্যালেস (Ducal Palace)। নবম শতাব্দীতে ছিল সরকারী দপ্তরখানা, বর্তমানে টিণ্টোরেট্টো, ভেনেস্‌সিয়ানো প্রমুখ বহু ভেনিসীয় শিল্পীর চিত্র স্থাপত্য ও ভাস্কর্য রক্ষিত ভিতরে।

ভেনিস ত্যাগ করলাম মনে বিশেষ ক্ষোভ না রেখে। বহু-বার শুনেছি এ শহরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, কিন্তু ভেনিসের নিজস্ব সৌন্দর্য আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেনি। চাঁদনী রাতেও গ্রাণ্ড কানালের জল গঙ্গোদকের মতই ঘোলাটে ঠেকেছে এবং দুপাশের চতুষ্কোণ গৃহশ্রেণীর মলিনতা মুছে যায় নি। এক রাতে প্রবল বৃষ্টিপাতের সঙ্গে তেড়ে এসেছিল হিংস্র মশার পাল—বোধহয় খালের জল থেকে। ভেনিস দেখেও মরতে আপসোস আছে আমার!

বিকেল সাড়ে তিনটেয় ট্রেনে চড়ে রাত্রি সাড়ে দশটায় ফ্লোরেন্স নগরীতে এসে পৌঁছালাম। পথে বোলোনিয়া শহরের একটু আগে পড়ল পো (Po) নদী—গত মহাযুদ্ধের বহু তীব্র সংঘর্ষের ক্ষেত্র। গাড়ি নদী পার হল অতি সন্তর্পণে এক অস্থায়ী কাঠের সেতুর উপর দিয়ে—আসল সেতুটা বোমা-বিধ্বস্ত।

আশেপাশে কাছাকাছি ভগ্ন সেতু ও ধ্বংশ আরো অনেক চোখে পড়ল। এর পরে পার্বত্যভূমি দেখা দিল ক্রমে, সুরঙ্গ পথের সংখ্যা বেড়ে চলল, তার অনেকগুলিই সুদীর্ঘ।

মিলান ও ভেনিসের পরে ফ্লোরেন্সের বিস্ময় উপভোগ্য। এও অবশ্য আধুনিক মহানগর নয়, কিন্তু পথঘাট পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ত, নিওন প্রদীপ চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। তাছাড়া ইটালীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দান্তে (Dante), বোকাচিও (Boccaccio) এবং পরবর্তী বহু প্রতিভার ধাত্রী ফ্লোরেন্স। পদে পদে বিবিধ বিচিত্র ঐতিহাসিক গৃহ ও মন্দিরের ছড়াছড়ি।

হোটেলের ব্যাপারে এখানে আমাদের ভাগ্য ছিল ভাল। উৎকৃষ্ট আসবাবপত্রে সুসজ্জিত প্রকাণ্ড ঘর পাওয়া গেল। তুষার-শুভ্র পালক-নম্র শয্যা মনোগ্রাম করা চাদরে ঢাকা। সঙ্গে নিজস্ব স্নানঘর, আয়তনে প্রায় শোবার ঘরেরই সমান, কম্বল-প্রমাণ বৃহৎ ধবধবে তোয়ালে অনেকগুলি। সব কিছুতে আধুনিকতার চাকচিক্য। অদৃশ্য কলের থেকে জল এসে নিমেষে স্নানের টব দিল ভরে। বহুকাল স্নানে এমন সুখ পাই নি। দৈনিক দশ শিলিং বা হাজার লিরা ; এদেশের এযাবৎ যা অভিজ্ঞতা তার তুলনায় বিস্ময়কর সন্দেহ নেই।

সকালে উঠে জানলা দিয়ে চেয়ে দেখি সামনে প্রশস্ত রাস্তা, তার পরেই নদী বয়ে চলেছে। বহু সেতু—কিছু কিছু বিধ্বস্ত।

এই আর্নো (Arno) নদীর নাম গতযুদ্ধে খবরকাগজে অনেকবার পড়েছি; এর দখল নিয়ে জার্মান এবং মিত্রশক্তির মধ্যে সংঘর্ষ চলেছিল বহুদিন, ভারতীয় সৈন্যও ছিল অনেক। আশে-পাশে এবং শহরের অন্যত্রও অনেক বাড়ি ধ্বংশ হয়েছে। সকালের রোদে নদীর ওপারে শহরের বহিরাংশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। ছোট ছোট টিলার গায়ে ছড়ানো সুন্দর ভিলা অনেক চোখে পড়ল। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম সেদিকে। একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপরে সুরম্য উদ্যান, প্রেমিক প্রেমিকার আদর্শ পরিবেশ। এরই একাংশের নাম পিয়াস্‌সালে মিকেলেঞ্জেলো (Piazzale Michelangelo), সেখানে ঐ শিল্পীর গঠিত বিখ্যাত ডেভিড মূর্তির এক প্রতিকৃতি শহরের মাথায় মুকুটের মত বিরাজ করছে।

ফিরে এলাম নদীর এপারে শহরের ঐতিহাসিক অন্তরস্থলে। মিলানের মত এখানেও Duomo বা ক্যাথিড্রাল অন্যতম প্রধান আকর্ষণ,—তার সংলগ্ন সুউচ্চ চৌকোণ ঘণ্টাঘর (belfry) এবং পাঁচকোণ দীক্ষামন্দির (baptistery) বিস্ময়ের বস্তু। অদূরে পালাস্‌সো ভেক্‌কিও (Palazzo Vecchio) বা পুরা-প্রাসাদ, তার ভিতরে বহু প্রকাণ্ড চিত্র ও মূর্তি। এর বহিরা-ঙ্গনের চারপাশেও অনেক বিশাল মূর্তির সারি, সবই অবশ্য গ্রীক-ইটালীয় বাস্তবিকতার ধারানুসারে গঠিত।

এ অংশের নাম পিয়াস্‌সা ডেলা সিনিয়রা (Piazza della Signora) অর্থাৎ 'শ্রীমতীর প্রাঙ্গন'। বিশ্রামের উদ্দেশ্যে সেখানে বসেছি ও লিরা কারবারীর দর্শনলাভ হবে আশা করছি। জুটেও গেল দুএকজন। আদানপ্রদানের সময় দেখি এক খাকি-সজ্জিত ভারতীয় অদূরে আমাদের লক্ষ করছেন। লোকগুলি চলে যেতে তিনি এগিয়ে এসে গম্ভীরভাবে জানালেন যে ওরা নির্ঘাত আমাদের ঠকিয়েছে—তিনি অনেক সুবিধায় টাকা ভাঙিয়ে দিতে পারতেন। যখন শুনলেন আমরা ২,১০০ লিরা পেয়েছি তখন আর সে প্রসঙ্গ অনুধাবন করলেন না। যাই হক, তাঁর সঙ্গে আলাপ হওয়াতে আমাদের দেখাশোনা এবং বেড়ানোর ব্যাপারে কিছু সুবিধা হল, তিনিও দেশের লোক পেয়ে খুব আনন্দিত হলেন। ভদ্রলোক দশবারো বছর এদেশে আছেন মুসলমানদের এক বিশেষ সম্প্রদায়ের ধার্মিক প্রতিনিধি হিসাবে। গতযুদ্ধের প্রথমে ভারতীয় বলে বন্দী ছিলেন অনেক দিন। পরে নাকি এক ষড়যন্ত্র গড়ে তুলে কিছু সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে পালিয়ে এসে মিত্রপক্ষের সঙ্গে যোগ দেন। আর্নো নদীর পারে কী বিক্রমে ভারতীয় বাহিনীর নেতৃত্ব করেছেন তিনি, জার্মানরা তাঁকে ধরতে প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও তিনি কি করে চাতুর্যের যুদ্ধে তাদের উপর জয়লাভ করেন ইত্যাদির অনেক গল্প শুনলাম তাঁর কাছে। জানিনা এ সবের কতদূর

সত্য, কিন্তু তালপাতার মত ক্ষীণ দেহ নিয়ে তিনি যখন বুক ফুলিয়ে নিজেকে 'ইণ্ডিয়ান জেনার‍্ল' বলে অভিহিত করতেন তখন কেমন সন্দেহের উদ্রেক হত। সে যাই হক, ভদ্রলোক আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করলেন। বিকেলে তাঁর বাড়িতে গিয়ে স্ত্রী এবং দুটি সুন্দর পুত্রকন্যার সঙ্গে পরিচয় হল। স্ত্রী ইংরেজ, বন্দী শিবিরে এঁদের প্রথম পরিচয়।

এ শহরে ইতিহাসের সঙ্গে মাখামাখি পদে পদে। চার্চ অব দি হোলি ক্রস-এর (Chiesa di S. Croce) ভিতরে প্রসিদ্ধ ফ্লোরেন্সবাসী মিকেলেঞ্জেলো, দান্তে ও মাকিয়াভেলি-র সমাধি,—বাইরে দান্তের এক সুন্দর মর্মরমূর্তি। পালাস্‌সো পিটি (Palazzo Pitti) সুবৃহৎ মিউজিয়াম—স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্র, আসবাবপত্র এবং নানাবিধ প্রাচীন দ্রব্যসম্ভারে (antiques) সজ্জিত। টিশিয়ান-এর (Titian) বহু বিখ্যাত চিত্র সংরক্ষিত আছে এখানে। এই গৃহ প্রথমে গড়েছিলেন পিটি পরিবার নিজেদের বসবাসের জন্য, পরে পরিণত হয়েছিল রাজপ্রাসাদে। রাজধানী রোমে স্থানান্তরিত হওয়ার পর থেকে হয়েছে মিউজিয়াম এবং বহু রাজকীয় সম্পত্তি থেকে গেছে এরই মধ্যে। সামনে সুন্দর বাগান।

শহরের বহিরাংশে ফিয়েজোল (Fiesole) অঞ্চল অত্যন্ত মনোরম বাসভূমি। ট্রলিবাসে চড়ে সেখানে গিয়ে এক ধ্বংশপ্রাপ্ত

রোমান অ্যামফিথিয়েটার দেখা গেল। খৃষ্টজন্মের পূর্বে ডিক্টেটর স্থলা (Dictator Sulla) এটি গড়েছিলেন। দোতলা একটি গৃহের সামনে ছিল ধাপকাটা অর্ধচন্দ্রাকার মল্লভূমি। এখন শুধু আছে দর্শকদের বসবার সেই ধাপগুলি, মল্লযোদ্ধাদের (gladiators) প্রবেশপথ এবং গুটিকয়েক স্তম্ভ। সংলগ্ন এক ছোট যাত্নঘরে আছে রোমান যুগের এবং তৎপূর্ব ইট্রুস্কান সভ্যতার নানাবিধ অলংকার, পাত্র ইত্যাদি।

ফ্লোরেন্স শহরে একটি মিশরীয় যুবকের সঙ্গে পরিচয় হল। ছিল জাহাজের এঞ্জিনিয়ার, স্বাস্থ্যের দোষে চাকরি যায়। কুড়ি লক্ষ লিরা নিয়ে নাকি সে ইটালিতে এসেছিল, মামা ঠকিয়ে নেয় সর্বস্ব। তারপর অনেক ঘাটের জল খেয়ে এ শহরে এসে জুটেছে। ছিন্ন মলিন বেশ, পরবর্তী আহার কখন মিলবে তার স্থিরতা নেই, আট মাস চাকরি জোটে না,—দিনে তিন শিলিং উপার্জনের জন্য সে সব কিছু করতে রাজি। কিন্তু ভিক্ষুক সে নয়, বরং নিজের সম্বন্ধে তার ভীষণ লজ্জা। এত সত্ত্বেও সর্বদা সে হাসিখুশী, রসিকতার সুযোগ পেলে কখনো ছাড়ে না। সাতটি ভাষা তার জিহ্বাগ্রে, দেখতে সুপুরুষ এবং অভিনয়ের ক্ষমতা অসাধারণ; বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির আশ্চর্য দক্ষ অনুকরণ যখন দেখাল, যুগপৎ মুগ্ধ এবং দুঃখিত হলাম এই ভেবে যে এমন গুণী লোকের এ অবস্থা কেন হয়। তাকে আমাদের গাইড

বানিয়ে নিলাম, কিন্তু পয়সা সে নেবে না। খাবার টেবিলে বসত সঙ্গে কিন্তু যথাসাধ্য খরচ বাঁচাত আমাদের।

বিখ্যাত উফিস্‌সি গ্যালারি (Uffizi Gallery) সংস্কারের জন্য তখন বন্ধ। এর মধ্যে আছে বহু প্রসিদ্ধ রেনেসাঁস (Renaissance) চিত্র। র‍্যাফেল-এর অনেক ছবি, দাভিঞ্চি-র 'ভিনাসের জন্ম' (Birth of Venus)। ন্যাশনাল মিউজিয়ামে দেখলাম মূর্তির সংগ্রহ; পাথরের উপর রিলিফ বা খোদাই ইত্যাদি। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মিকেলেঞ্জেলোর কয়েকটি সুন্দর কাজ: ম্যাডোনা-র রিলিফ, বেকাস (Bacchus) এবং ব্রুটাস-এর (Brutus) মূর্তি। শেষোক্ত মূর্তি শিল্পীর পরিণত বয়সের কাজ এবং মোজেস বা ডেভিড-এর প্রতিকৃতির মত তাঁর ভাস্কর্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ এর মধ্যে। সমস্ত দেহে আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব ও তেজের ছাপ চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। এছাড়া মিকেলেঞ্জেলোর স্বরচিত স্বমূর্তিও আছে এখানে: মধ্যবয়সী, চ্যাপ্টানাক একটি লোক—লালিত্যহীন চেহারা। বেনভেনিউটো সেলিনি (Benvenuto Cellini) গঠিত বহু মূর্তিও এই গ্যালারির বিশেষ দ্রষ্টব্য।

রোম। 'শাশ্বতী নগরী'। 'কত সাম্রাজ্যের উত্থানপতনের রঙ্গভূমি, কত বিরাট প্রতিভার লীলাক্ষেত্র। সীজার, মার্ক এ্যাণ্টনি, নিরো, মার্কাস অরেলিয়াস, গারিবল্ডি, মুসোলিনি,

মিকেলেঞ্জেলো, র‍্যাফেল এখানে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন। রোমের পথেঘাটে কত বিগত যুগ নির্বাক হয়ে আছে ; পদে পদে ইতিহাসের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়। সে এক আশ্চর্য শিহরণ!

আজ রোম আধুনিক রাজধানী। কিন্তু এর সুপ্রশস্ত রাজপথ, নতুন ফ্ল্যাটবাড়ি, আলোকোজ্জ্বল বিপণিশ্রেণীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত অসংখ্য পৌরাণিক ধ্বংশ—প্রাক্তন রাজ-প্রাসাদ, মন্দির, সভাক্ষেত্র (Forum) ইত্যাদি। তাছাড়া আছে ৪০০ গির্জা (কিছু প্রোটেস্টাণ্ট), একটি ইহুদী মন্দির, বহু মিশরীয় মর্মরস্তম্ভ (obelisk) এবং একটি পিরামিড, ২৫০ প্রকাণ্ড ফোয়ারা, অসংখ্য উদ্যানে অগণ্য মূর্তি, ইত্যাদি ইত্যাদি। রোম দেখে দেখে শেষ হয় না।

দুপুর আড়াইটেতে ফ্লোরেন্স ছেড়ে বৈদ্যুতিক ট্রেনে রাত সাড়ে নটায় রোমে আসা গেল। পরদিন সকালে এক ভ্রমণ বাসের টিকিট কিনলাম সারাদিনের জন্য। রোমের মত জায়গা দেখতে এ ব্যবস্থায় অনেক সুবিধা। অল্প খরচে এবং কম সময়ে প্রধান দ্রষ্টব্যগুলি দেখা যায়, সুদক্ষ গাইডের আওতায়। আমাদের গাইড সত্যিই বিশেষ পারদর্শী,—রস এবং তথ্য একযোগে ঠিক উপযুক্ত পরিমাণে পরিবেশন করবার অসাধারণ ক্ষমতা তার। বাসে সহযাত্রীরা নানাদেশের নানা অবস্থার নরনারী—বোধহয় মার্কিন পর্যটকদেরই প্রাধান্য।

ভিয়া ভিট্টোরিয়ো ভেনেটো (Via Vittorio Veneto) এ নগরীর চৌরঙ্গী। সেই রাস্তা ধরে গিয়ে প্রথমে ঢুকলাম কাপুচিন ধর্মসংঘের (Capuchin Friars) এক গির্জার নিচে অন্ধকার সংকীর্ণ কুঠরিতে,—এখানে এদের ৪০০০ সন্ন্যাসীর খুলি ও কঙ্কাল সংরক্ষিত। সেই মৃত্যুগন্ধময় ভূগর্ভের থেকে বেরিয়ে বাইরের খোলা হাওয়া খুবই মিষ্টি লাগল। এর পরে পথে পড়ল পিয়াস্‌সা কলোনা (Colonna) উদ্যান, তার মধ্যে ১২৯ সালে গঠিত এক জয়স্তম্ভ,—মার্কাস অরেলিয়াস যে জার্মান, আর্মেনিয়ান ইত্যাদি বাহিনীকে বিধ্বস্ত করেছিলেন তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। তারপর প্যানথিয়ন (Pantheon); পেগানরা খৃষ্টপূর্ব সাতাশ অব্দে গড়েছিল এই বিশাল মন্দির, তাদের বহু দেবতার পূজার জন্য। অখণ্ড এক পাথরের তৈরি প্রকাণ্ড স্তম্ভ এবং পিতলের বিরাট দরজা আজো বেশ দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরে বহু রাজার এবং শিল্পী র‍্যাফেল-এর সমাধি। ইনি মারা গিয়েছিলেন মাত্র ৩৭ বছর বয়সে,—অদূরে রেনেস াঁস প্যালেসে দেখলাম তাঁর স্টুডিও।

শহরের একাংশে দেয়াল দিয়ে ঘেরা ক্ষুদ্র ভ্যাটিকান সিটি (Vatican City), পোপ-এর স্বাধীন রাজ্য। সেখানে পৃথিবীর বৃহত্তম গির্জা, সেইন্ট পীটার্স চার্চ; সারা জগতের ক্যাথলিকদের আধ্যাত্মিক অন্তরস্থল। সামনে বিশাল প্রাঙ্গনের (Saint

Peter's Square) দুপাশে অর্ধচন্দ্রাকারে স্থাপিত উত্তুঙ্গ স্তম্ভশ্রেণী এবং তার শীর্ষে বিবিধ মূর্তির সারি গগন স্পর্শ করছে ; পরিকল্পনা করেছিলেন বিখ্যাত বের্নিনি (Bernini)। গির্জার সবকিছুই বৃহদায়তন—বিস্ময়ের বাঁধ মানে না। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য প্রতিভার বহু আশ্চর্য বিকাশ সর্বাঙ্গে। গম্বুজটির পরিকল্পনা মিকেলেঞ্জেলোর অন্যতম প্রধান কীর্তি। তাঁর গঠিত 'ভক্তি' (Pieta') মূর্তি ভিতরে রক্ষিত : মেরির কোলে মৃত যিশু। কাছেই এক গৃহে বাস করেন পোপ, গির্জার বারান্দায় এসে দেখা দেন জনতার সামনে। পীটার এবং পল হলেন রোমের দ্বৈত ধর্মগুরু বা 'পেট্রন সেইন্ট'। একজন প্রাণ দিয়েছিলেন ক্রুসে বিদ্ধ হয়ে, অন্যজনের শিরচ্ছেদ করা হয়।

হোটেলে ফেরার পথে পড়ল একটি টিলা, নাম জানিকুলাম (Janiculum) পাহাড়। উপরে খেজুরজাতীয় বৃক্ষশ্রেণী জায়গাটাতে কিছুটা প্রাচ্য দেশের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। মাঝখানে গারিবল্ডির এক অশ্বারোহী মূর্তি। এখান থেকে প্রায় সমস্ত রোমের দৃশ্য ছবির মত দেখা যায় ; বহু গির্জার চূড়া (cupola), দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুএল স্মারক, রাজপ্রাসাদ কিরিনালে (Quirinale), রোমের প্রাবাদিক সপ্তগিরি, ইত্যাদি। বাঁ দিকে শহরের নতুনাংশ, এবং তার পরে ভ্যাটিকান সিটির প্রাচীর।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর একটু বিশ্রামের সময় পাওয়া গেল। সেটুকুর প্রয়োজন ছিল। জুলাই মাসের ইটালীয় গ্রীষ্ম তখন কলকাতার চেয়ে কিছুমাত্র কম ক্লান্তিকর নয়। প্রখর রৌদ্রদীপ্ত পথে লোকজন বেশী নেই, দোকানের সামনে ভিজে খশখশ ঝুলছে, সমস্ত শহর ঝিমিয়ে পড়েছে। সৌভাগ্যক্রমে য়োরোপীয় গ্রীষ্মে অন্ধকার হয় অনেক দেরিতে, সুতরাং বিকেলের দিকে বেরিয়েও দেখে বেড়াবার সময় পাওয়া গেল বেশ।

পালাস্‌সো ভেনেস্‌সিয়া (Palazzo Venezia) এবং তার সম্মুখীন চতুষ্কোণ প্রাঙ্গনকে মুসোলিনি প্রসিদ্ধ করে রেখে গেছেন। এই গৃহের সামনের বারান্দায় এসে তিনি দাঁড়াতেন, 'জ্বালাময়ী' বক্তৃতায় মাতিয়ে তুলতেন নিচের জনতাকে। ছবিতে চলচ্চিত্রে বহুবার দেখেছি এই ঐতিহাসিক বারান্দা ও প্রাঙ্গন, কিন্তু এখন এদের সাধারণ চেহারা ও সংকীর্ণ আয়তন দেখে অবাক হতে হল। বাড়িটাও যেন জেলখানার মত জৌলষহীন। কাছেই দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুএল স্মৃতিস্তম্ভ,—চমক লাগল সেদিকে চেয়ে। অনেকে বলে জগতে এর জুড়ি স্মারক আর নেই কোথাও। পরিকল্পনা যুগপৎ সরল ও অভিনব,—শুভ্র সোপানশ্রেণীর পাশে ও উপরে মূর্তিগুলি সম্ভ্রম ও প্রশংসা জাগায়। এই রাজাই প্রথম গারিবল্ডির সঙ্গে যুক্ত হয়ে লড়েছিলেন ইটালির একীকরণের জন্য।

অন্যান্য দ্রষ্টব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাপিটল (Capitol) স্কোয়ার। খৃষ্টানরা প্রাচীন রোমের সমস্ত অশ্বারোহী মূর্তি ধ্বংশ করে ফেলেছিল, নিজেদের প্রভুত্বের নিদর্শনস্বরূপ। নিষ্কৃতি পেয়েছিল একমাত্র মার্কাস অরেলিয়াস-এর এক মূর্তি, সেটি এখানে অবস্থিত। পেগানদের বহু প্রাচীন মন্দির এখনো দেখা যায় রোমে। প্রোটেস্টাণ্ট গোরস্থানে ছায়াশীতল নির্জনতার মধ্যে কীট্স ও শেলি-র সমাধি। শেলি-র হৃদয়টি শুধু এখানে, দেহ রক্ষিত ইংলণ্ডে। এ শহরের দ্বিতীয় বৃহত্তম গির্জা সেইণ্ট পল্স চার্চও দেখবার মত।

রোমের ঐতিহাসিক ধ্বংশের মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর এবং রোমাঞ্চকর খৃষ্টানপূর্ব দিনের কলসিউম (Colosseum) এবং ফোরুম (Forum)। প্রথমটি এক সুবিশাল অ্যামফিথিয়েটার বা মল্লভূমি। নিরো-র (Nero) স্বর্ণপ্রাসাদের ভূমিতে সম্রাট ভেসপাসিয়ান (Vespasian) আরম্ভ করেছিলেন এ গৃহ এবং টাইটাস (Titus) ৮০ সালে এর দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন। গঠন ডিম্বাকৃতি, ব্যাস এক-তৃতীয়াংশ মাইল। মধ্যে তিনটি পাথরের ধাপে চল্লিশ হাজার দর্শকের বসবার জায়গা—উচ্চতা ১৬০ ফুট—এবং ঊর্দ্ধ্বে আরো দশ হাজার 'ছোটলোকের' (Plebeians) দাঁড়াবার স্থান। উপরে থাকত সামিয়ানার ছাত —তার মাঝখানে ফুটো। প্রধানত চার রকমের নৃশংস ক্রীড়ার

আসর জমত এখানে : ক্রীতদাস বা খৃষ্টানদের ছেড়ে দেওয়া হত হিংস্র পশুর সামনে ; সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামতেন স্ত্রীলোকের বা নিজেদের সম্মান সংরক্ষণের জন্য ; পেশাদার যোদ্ধারা দেখাতেন তাদের নৈপুণ্য ; এছাড়া ছিল মেঝেতে জল ঢেলে নৌকায় চড়ে নৌ-যুদ্ধ। বিশিষ্ট আসন ছিল সম্রাট এবং দেবদাসীদের* জন্য। এদের জন্য তুটি এবং যোদ্ধাদের ও মৃতদেহের আনাগোনার জন্য ছিল আরো তুটি পৃথক দরজা। এই দেবদাসী বা ভেস্টা কুমারীরা অনেকটা বিচারকের কাজ করতেন। আহত যোদ্ধা এদের কাছে মুক্তি ভিক্ষা করতে পারত এবং এরা রায় দেবার আগে বিবেচনা করতেন সম্রাটের ও দর্শকদের মেজাজ কেমন, যোদ্ধা কেমন লড়েছে, ইত্যাদি।

এই বিশাল রঙ্গমঞ্চের কিছুটা ধ্বংশ হয়েছে বটে কিন্তু যা এখনো দাঁড়িয়ে আছে তার তুলনা জগতে আর কোথাও মেলে কিনা সন্দেহ। উত্তুঙ্গ প্রাচীরের ছায়ায় বসে নিচের প্রকাণ্ড গহ্বরটার দিকে চেয়ে নিজেকে মনে হয় নিতান্ত ক্ষুদ্র। কিন্তু তবু অতিকায় কোনো প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর কঙ্কাল ছাড়া আজ এ আর কিছু নয়। আনাচে কানাচে আগাছার রাজত্ব ও ক্ষয়িষ্ণু পাথর বিরাট শক্তির অধঃপতনেরই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

দেহশক্তির এই লীলাক্ষেত্র ছেড়ে গেলাম আলোচনা ও

---

* বাস্তুদেবী ভেস্টার নিবেদিতা—Vestal Virgins.

অনুশীলনের মন্দির ফোরুম দেখতে। প্রবাদ বলে, নেকড়ের স্তন্যে লালিত দুই যমজ ভাই রেমুস (Remus) এবং রোমিউলুস (Romulus) প্রথমে পালাটিন (Palatine) পাহাড়ে রোম শহর প্রতিষ্ঠা করেছিল। তারপর এরই উপরে কালিগুলা (Caligula) প্রমুখ সাতজন সম্রাট একে একে তাঁদের প্রাসাদ গড়েছিলেন—তন্মধ্যে একটি ছিল সাততলা উঁচু। এসবের কিছু কিছু অংশ এখনো দাঁড়িয়ে আছে। পালাটিন ও কাপিটলিন (Capitoline) পর্বতের মধ্যবর্তী উপত্যকায়, বর্তমান শহরের কেন্দ্রস্থলে, রোমান ফোরুমের ধ্বংশাবশেষ।

উন্মুক্ত প্রাঙ্গনের চারপাশে আদালত বা বাসিলিকা (Basilica) মন্দির তোরণ বেদী ইত্যাদি। শনি এবং অন্যান্য কোনো কোনো দেবদেবীর মন্দিরের সুউচ্চ স্তম্ভ এখনো এখানে ওখানে একলা দাঁড়িয়ে আছে আকাশের গায়ে অঙ্গুলি-নির্দেশের মত। সমস্ত জায়গাটা এখন মাটির অধস্তন স্তরে—নিচের দিকে তাকিয়ে সবকিছু ছবির মত দেখা যায়। মুগ্ধ বিস্ময়ে সহযাত্রীরা সকলে এদিকে ওদিকে বসে পড়েছে, একটুখানি ছায়া খুঁজে নিয়ে। মেয়েরা বিশেষত রৌদ্রতাপে বড় ক্লান্ত, অঙ্গরেণু ও সৌরভ ব্যবহার করছে অজস্র।

অনেকক্ষণ বসে রইলাম। দেখলাম ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে মার্ক এ্যাণ্টনি (Marc Antony) তার প্রসিদ্ধ বক্তৃতা করেছিল

সীজার-এর হত্যার পরে, কোথায় সীজারকে দাহ করা হয়েছিল। সেকালের দিনে এই ধ্বংশস্তূপের অঙ্গন ও প্রকোষ্ঠ অনুশীলন আলোচনা ও চক্রান্তে কেমন চঞ্চল ও মুখর ছিল তা যেন কল্পনা করা যায়! বিকেলের পড়ন্ত রোদে তোরণের ছায়া ক্রমশ প্রলম্বিত হয়ে উঠল।

মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারি দেখার পক্ষে বাস সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘোরা বিশেষ সুবিধাজনক নয়, ওতে সময় পাওয়া যায় বড় কম। রোমের শিল্পসম্পদ একলা একলা ধীরেসুস্থে দেখলাম পরে কদিন। জগতবিখ্যাত ভ্যাটিকান গ্যালারি এত বিচিত্র এবং এত প্রকাণ্ড যে দেখে শেষ করে ওঠা যায় না। ছবির মধ্যে র‍্যাফেল অঙ্কিত প্রাচীরচিত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্রাট কনস্টান্টিন-এর (Constantine) জয়গান গেয়েছেন শিল্পী এই চিত্রশ্রেণীর মধ্য দিয়ে,—কেমন করে তিনি পেগান ম্লেচ্ছদের পরাজিত করলেন, খৃষ্টধর্মের ধ্বজা তুলে ধরলেন। বহু রোম-সম্রাটের, দেবদেবীর, পশুপাখির মূর্তি। লাইব্রেরিতে অনেক প্রাচীন পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি।

বরগীজ (Borghese) গ্যালারিও সুপ্রসিদ্ধ। প্রথমে এ ছিল কুখ্যাত বর্জিয়া (Borgia) পরিবারের নিজস্ব সংগ্রহ, এখন সরকারী সম্পত্তি। বের্নিনি (Bernini) গঠিত বহু মূর্তি এখানকার বিশেষত্ব। নেপোলিয়নের ভগ্নীর বিয়ে হয়েছিল

বর্জিয়া পরিবারে, সেকালে সে নাকি ছিল শ্রেষ্ঠা রূপসী—তার মূর্তি আছে এখানে। ভাস্কর্যের আরেকটি আশ্চর্য নিদর্শন চোখে পড়ল : জুনো কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে প্রোসেপিন-কে। বটিচেলি, র‍্যাফেল, টিশিয়ান ইত্যাদির ছবি আছে অনেক,—বিশেষ উল্লেখ-নীয় র‍্যাফলের 'সমাধি' (Entombment) এবং টিশিয়ানের 'শুদ্ধ ও অশুদ্ধ প্রেম' (Sacred and Profane Love)।

শুনেছিলাম মিকেলেঞ্জেলোর মোজেস (Moses) মূর্তি তাঁর ভাস্কর্য প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। 'শৃঙ্খলিত সেইণ্ট পীটার'-এর গির্জায় (Church of Saint Peter in Chains) গিয়ে দেখলাম সেই মূর্তি। শিল্পে বাস্তবিক (realistic) ধারার সত্যি এ এক চরম নিদর্শন।

অন্যান্য অনেক বড় শহরের মত রোমের অন্তরেও বয়ে গেছে এক নদী। কিন্তু এই টিবের (Tiber) নদীর মত ঐতিহাসিক স্মৃতিজড়িত নয় আর কোন স্রোতস্বিনী।

এত কথার পরে মনে হতে পারে রোম শহর বুঝি এখনো প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। আসলে নতুন ও পুরাতনের অন্তরঙ্গতা চোখে পড়ে বারে বারে। ফাশিস্ট কুচকাওয়াজ ও ক্রীড়ার ক্ষেত্র (stadium) মুসোলিনি ফোরুম আধুনিকতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ; এবং এর কাছাকাছি উন্মুক্ত পরিবেশের মধ্যে অনেক আধুনিক বাসাঞ্চল।

অবশেষে সময় এল ইটালির থেকে বিদায় নেবার। একদা রাত বারোটায় এদের নতুন রেলস্টেশনে ট্রেন ধরলাম, ভাগ্যক্রমে শোবার জায়গা পাওয়া গেল। চব্বিশ ঘণ্টা পরে পৌঁছাব পশ্চিম সুইৎসার্লাণ্ডের লোজান (Lausanne) শহরে। কামরায় সঙ্গী আমাদের এক ইংরেজ সৈনিক, সে যাচ্ছে প্যারিস হয়ে দেশে; জনৈকা ইটালীয় তরুণী ও তার শিশু কন্যা,—এরা যাচ্ছে সুইৎসার্লাণ্ডে আত্মীয়গৃহে বেড়াতে; আর আছে এক স্বল্পভাষী সুদর্শন ইটালীয় যুবক—বেচারা শোবার জায়গা পায়নি, বসেই কাটাবে—যাচ্ছে ইংলণ্ডে এক কমিউনিস্ট বৈঠকে। ইটালীয় দুজনেই পরিষ্কার ইংরেজী বলেন। শোবার আগে সবার মধ্যে কিছুক্ষণ আলাপ হল। যুদ্ধকালে জার্মানরা মহিলাটির বাড়ি দখল করেছিল,—বললেন তাদের অত্যাচারের গল্প। অবশেষে শোবার তোড়জোড় করে সৈনিক প্রবর জানলা বন্ধ করবার উদ্যোগ করলে। উষ্ণ দেশের লোক আমরা দুই ভারতীয় ভীষণ আপত্তি জানালাম; জানলা বন্ধ করলে এই গরমে প্রাণেই মারা যাব। ইংরেজও নাছোড়বান্দা, তার শীত করছে। অবশেষে ভোট গ্রহণ করা হল,—ফলে জানলা খোলা রেখে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুতে হল তাকে। 'জয় হক গণতন্ত্রের' বলে আমরাও নিশ্চিন্তে শয্যা গ্রহণ করলাম।

ক্রমে সবারই চোখ বন্ধ হয়ে এল। মধ্যরাত্রির স্তব্ধতার

মধ্যে শুধু ট্রেনের গর্জন। বিগত কদিনের অনেক স্মৃতি অনেক অভিজ্ঞতা অন্ধকারে চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে। তার হয়তো কিছু তিক্ত, কিন্তু অধিকাংশই মধুর। সবচেয়ে বেশী লক্ষ করেছি যে য়োরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় ইটালি অপরিচিতের মনে এক নিজস্ব ছাপ রাখে—য়োরোপীয় নয়, ইটালীয় ছাপ। এদের চুল-চোখের রং, নাক-মুখের আদল প্রায়ই উত্তর ও মধ্য য়োরোপের থেকে ভিন্ন প্রকৃতির, কখনো অনেকটা আমাদের মত। এছাড়া আরো অনেক কিছু দেখে এখানে নিজের দেশের কথা মনে পড়ে। মায়েরা শিশুদের স্তন্য দিচ্ছে, কোলে নিয়ে বেড়াচ্ছে; রাস্তার ধারে বিক্রি হচ্ছে কাটা তরমুজ ও আরো অনেক সুস্বাদু সস্তা ফল; সবজির মধ্যে আছে বেগুন; ইটালীয় রান্না রসনাকে তৃপ্তি দেয়; দোকানদারের সঙ্গে দরকষাকষি, ঝগড়া; নোংরা ট্রেনে ভীড়, সময়ের হিসেব নেই।...

এদেশের শহরগুলি ঠিক য়োরোপীয় মহানগর নয়, সন্ধ্যায় নেই অত আলো আর সঙ্গীতের বন্যা। খাদ্য, পোশাক, আসবাবপত্র, লোকজনের মুখ দেখলে বোঝা যায় যে বিশেষ করে যুদ্ধের পরে বড় গরিব হয়ে পড়েছে এরা। তবু মনুষ্যত্বের সহজ সম্পদ যেন হারায় নি। মনে পড়ে রোমের হোটেলে যে মেয়েটি ঘর পরিষ্কার করতে আসত তার সহজ সরল হাসির

ভাবখানি, কথায় কথায় গ্রাৎসি (ধন্যবাদ) বলার আগ্রহ। রাতে যে রেস্তরাঁয় খেতে যেতাম সেখানে চার পাঁচ জনে মিলে কত যত্নে পরিবেশন করত আমাদের। মনে পড়ে ভেনিসের পথে ট্রেনের সেই বুড়ো। আরো কত ছোট ছোট টুকরো টুকরো ঘটনা—স্ন্যাপশট ছবির মত যা সযত্নে জমিয়ে রাখতে ইচ্ছে করে। যে অন্তর্নিহিত ক্ষমতার গুণে কৃষ্টির ক্ষেত্রে এরা বারে বারে অবিনশ্বর সৃষ্টির স্বাক্ষর রেখেছে, আবার যে তার আত্মপ্রকাশ দেখব তাতে সন্দেহ থাকে না। যুদ্ধোত্তর য়োরোপে এরই মধ্যে শিল্পের ক্ষেত্রে—চিত্রে ভাস্কর্যে ও বিশেষ করে চলচ্চিত্রে—ইটালীয় সৃষ্টির মৌলিকতা ও বলিষ্ঠতা জগতের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বাইরের দুর্গতি ও অসম্মান রোধ করতে পারবে না সেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব একমাত্র যা মানুষকে নিজের মর্যাদা দিতে পারে।

সুইৎসার্লাণ্ড

পরদিন দুপুরে মিলান স্টেশনে অপেক্ষা করতে হল চার ঘণ্টা। প্রচণ্ড গরম, স্টেশনের ভাঙা ছাতের ভিতর দিয়ে রোদ এসে পড়ে তাতিয়ে দিয়েছে প্লাটফর্ম। কলের জলে মাথা ধুয়ে বারে বারে রুমাল ভিজিয়ে হাত মুখ মুছছি। ইংরেজ সৈনিক প্রবল আনন্দে ঘর্মাক্ত দেহে বেড়াতে বেরিয়ে গেল। ইটালীয় সিনিয়রা পাউডার ও গন্ধ মেখে দেহসৌষ্ঠব বজায় রাখার ব্যর্থ চেষ্টা ত্যাগ করলেন শেষপর্যন্ত। একমাত্র তার বাচ্চা মেয়েই বেশ ফুর্তিতে নেচে খেলে বেড়াচ্ছে।

ইটালীয় সীমান্তের একটু আগে পড়ল পর্বতপরিবৃত বিশাল হ্রদ 'লেক মেজর্কা' (Lake Majorca)। মনোহর দৃশ্য। সুইৎসার্লাণ্ডে ঢুকে মঁত্র (Montreux) শহরের পর ভেভে (Vevey); সেখান থেকে প্রসিদ্ধ 'জেনিভা হ্রদ' আমাদের বাঁ পাশে চলল আধঘণ্টা। দেড়শো কিলোমিটার (প্রায় একশো মাইল) দীর্ঘ এই সুপ্রশস্ত হ্রদের থেকে উঠেছে সুরম্য গিরিমালা। বর্ণবৈচিত্র্যের জন্য এর জল বিখ্যাত। বর্ধিষ্ণু

চাঁদের জ্যোৎস্নায় ছোট ছোট তরঙ্গ রুপালী আলো ছিটিয়ে ভেঙে ভেঙে পড়ছে।

লোজান শহরে আস্তানা জুটিয়ে পরদিন সকালে এলাম স্টেশনে জেনিভা যাব বলে। প্লাটফর্মে বসে কথা বলছি, হঠাৎ একটি কৃষ্ণকায় ভদ্রলোক সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমাদের কথা শুনে জাত চিনেছেন ঠিক, তবু আলাপ শুরু করবার জন্য প্রশ্ন করলেন, "আপনারা কি বাঙালী ?"

আলাপ জমবার আগেই হুড়মুড় করে ট্রেন এসে গেল। এও সেই সাদা ঝকঝকে ধাতব গাড়ি। ভদ্রলোক আমাদের টেনে তুললেন রেস্তরাঁ কামরায়। যাত্রীরা সব চলেছে জেনিভায় আপিশ করতে। ওদেশের উৎকৃষ্ট বীয়ার সামনে নিয়ে আমাদের গল্প জমে উঠল।

জানা গেল ঘোষ মশায় বহুকাল দেশ ছেড়েছেন। অনেক-দিন কষ্ট করার পরে হলাণ্ডে ব্যবসায়ে বেশ প্রতিপত্তি করেন। যুদ্ধে সব গোলমাল হয়ে যায় এবং সম্পত্তির অধিকাংশ নষ্ট হয়। জার্মান বন্দীখানার থেকে ছাড়া পেয়ে এখন এদেশে আবার ব্যবসা গড়ে তুলেছেন। থাকেন ভেভে-তে, রোজ আপিশ করেন জেনিভায়। দূরত্ব কম নয়, কিন্তু দ্রুতগামী বৈদ্যুতিক ট্রেনে মাত্র মিনিট কয়েকের পথ। বিকেলে তার বাড়ীতে যাব কথা দিতে হল।

এদের অন্যান্য শহরের মত জেনিভাও ঝকঝক তকতক করছে, উপরন্তু প্রকৃতি বিশেষ সদয় এখানে। লেক জেনিভা-র পার ধরে দীর্ঘ প্রশস্ত রাস্তা। ঘাস আর গাছপালার সবুজ চোখে পড়ে শহরের সর্বত্র। এই গ্রীষ্মে ছায়া-ঢাকা রাস্তায় হাঁটতে বা গাছতলায় দু দণ্ড বিশ্রাম করতে ভারি আরাম। বুলেভার দ্য ফ্রাঁস-এ অনেকখানি জমিতে লীগ অব নেশন্‌স-এর সুদৃশ্য আধুনিক সৌধশ্রেণী ; ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দপ্তরখানার মধ্যে প্রধান সভাগৃহের বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। সংলগ্ন এক উদ্ভিদ-উদ্যান। সবুজ মাঠ, নানারঙের অজস্র ফুল আর ছায়াঘন গাছের মধ্য দিয়ে প্রশস্ত চকচকে রাস্তা গাড়ি যাবার জন্য। সব ঘিরে অখণ্ড নীরবতা আর প্রশান্তি ; সহজেই কাজে মন বসতে চায়। এমন পরিবেশেও যখন বিশ্বের শান্তি খুঁজে পাওয়া গেল না, এবার নিউ ইয়র্কে পাওয়া যাবে কি !

কেন যে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে ধনীর দল এসব জায়গায় আসেন আরামের জীবন কাটাতে, তা বুঝতে পারি। সুনিয়ন্ত্রিত বাসব্যবস্থা, বিলাসের সমস্ত উপকরণ এখানকার স্বাভাবিক দৈনন্দিন রীতি। লোকজনের দেহে স্বাস্থ্য, মনে আনন্দ ; পুষ্টিকর সুস্বাদু অন্ন, সুদৃশ্য আরামদায়ক বস্ত্র। নিরক্ষরতার হার এদেশে পৃথিবীর মধ্যে নিম্নতম—নেই বললেই চলে। শতকরা নিরানব্বইটি ঘরে আছে বিদ্যুৎ, উপরন্তু বিদেশে

রপ্তানি হয় অনেক বিদ্যুৎশক্তি। এসব ছাড়া প্রকৃতি অতীব সদয়।

বিকেলে ঘোষ মশায়ের সঙ্গে একেবারে ভেভে-তে গিয়ে নামলাম। জেনিভা হ্রদের ধারে তার বিরাট অট্টালিকা। সেখানে তার অস্ট্রিয়ান পত্নী ও পুত্রের সঙ্গে আলাপ হল। সুভাষচন্দ্রের বিবাহ এবং তাঁর স্ত্রী ও কন্যার যা বর্ণনা শুনলাম এদের কাছে তখন তা ভাল করে বিশ্বাস না হলেও পরে তার সবই অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রকাশিত হয়েছে। চা পানের পর জলে নেমে স্নান। এমন অবগাহনের তৃপ্তি দেশ ছাড়বার পরে আর হয়নি। দিনের মধ্যে যখন তখন এবং যতবার খুশী এরা জলে নেমে পড়েন জেনে ভীষণ হিংসে হল এদের। হ্রদের চারপাশে যে পাহাড়শ্রেণী দেখা যাচ্ছিল তা এদেশের এবং য়োরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াক্ষেত্র—'সুইস্ রিভিয়েরা' নামে খ্যাত। পাহাড়ের গায়ে গায়ে বহু হোটেলের ছড়াছড়ি, শীতের দিনে ক্রীড়ামোদী পর্যটকের ভীড়ে ভরে যায়। তখন প্রচুর তুষারপাতের মধ্যেও দিন থাকে রৌদ্রোজ্জ্বল। শ্রীমতী কমলা নেহেরু নাকি এইখানেই এক স্যানাটোরিয়ামে মারা যান। সাঁতারের মধ্যে দেখলাম বহু বিহাররত মোটর বোট। দু একটি আকাশযানও জলে নামল, আবার উড়ে গেল।

দেখা গেল জলের উপর দিকে মাছ অনেক চরে বেড়াচ্ছে।

স্নানের পরে মাটি খুঁড়ে বার করা হল কেঁচো, তারপর ঘোষ মশায়ের ছিপ নিয়ে বসে গেলাম। তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে আসছে, তবু তার মধ্যে গোটাকয়েক মাছ ধরে ফেলে ঘোষ পরিবারকে উপহার দেওয়া গেল।

বাগানে গাছতলায় সবাই বসেছি, সঙ্গে সুস্বাদু শীতল পানীয়। পাহাড়ের আড়াল থেকে চাঁদ উঠল নির্মেঘ নির্মল আকাশে। সবুজ আর রুপালী রেখায় জ্যোৎস্না প্রলম্বিত হয়ে পড়েছে হ্রদের স্থির জলে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে চিত্রিত হয়ে পড়েছে ঘাসের উপর আমাদের আশেপাশে। আধ-অন্ধকারে চতুর্দিকের গিরিশ্রেণী যেন তাদের স্বাভাবিক বন্য রূপে দেখা দিল। শুধু মাঝে মাঝে ছোট ছোট কম্পমান আলোগুলি প্রায় শিখর পর্যন্ত মানুষের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

ফ্রান্স

এরপর একদিন লোজান থেকে দুপুরে গাড়ি ধরে ভালোর্ব ও ডিজঁ-র পথে রাত এগারোটায় প্যারিসে এসে পৌঁছালাম। ইচ্ছে এখানে কিছুদিন থাকব এবং ধীরে সুস্থে শহর দেখব। জানা ছিল যুদ্ধের পর এদেশে দরদস্তুরের বাঁধ বিশেষ কিছু নেই। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের রেল স্টেশনের (Gare du Nord) কাছে এক নাতিদুর্মূল্য হোটেলে দুটি ভাল ঘর জুটল; দুটি মার্কিন মেয়ে চলে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঢুকে পড়লাম। যত দেশ বেড়িয়েছি তার মধ্যে এখানেই ভাষার অসুবিধে টের পাচ্ছি সবচেয়ে বেশী, প্রধানত উচ্চারণের দুরূহতার জন্য। আমাদের সঙ্গে কুক-এর (Cook) এক বই,—পর্যটকদের যাবতীয় যত প্রশ্ন তা তার মধ্যে তর্জমা করা চারটি প্রধান য়োরোপীয় ভাষায়। অন্যত্র সেগুলি পড়ে একরকম কাজ চলত, কিন্তু এখানে পৃষ্ঠায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। সুইৎসার্লাণ্ডে লুসার্ন অঞ্চলে জার্মান ভাষা, জেনিভা লোজান ইত্যাদি অঞ্চলে ফরাসী ভাষা এবং

ইটালীয় সীমান্তের কাছে কোথাও কোথাও ইটালীয় ভাষার চল।

এদেশে এসেও গরম কিছু কমে নি, কাগজে দেখলাম তাপ ১০৫ ডিগ্রি, দক্ষিণে রিভিয়েরা উপকূলে ১১০ ডিগ্রি। বেড়াতে বেড়াতে কেবলই কাফের সামনে রাস্তার উপর বসে পড়ছি আর হুকুম করছি 'লা গ্লাস' অর্থাৎ আইসক্রীম। আকাশ নীল, রোদে য়োরোপীয় গ্রীষ্মের মাদকতা।

নাগরিক সৌন্দর্যে অর্থাৎ পথঘাট ঘরবাড়ির পরিকল্পনায় প্যারিস সত্যিই অন্যান্য শহরকে হার মানায়। এতোয়াল (Etoile) কেন্দ্রে বারোটি প্রশস্ত রাজপথের সংগম, উত্তুঙ্গ জয়তোরণের (Arc de Triomphe) পাদদেশে। নেপলিয়ন নির্মিত এই তোরণের নিচে অনির্বাণ ধুনো জ্বলছে—প্রথম মহাসমরের 'অজানা মৃত সৈনিক'-এর উদ্দেশে। আভেন্যু ফক (Foch) সুন্দর রাজপথ—রাস্তা, ফুটপাথ ও তার পাশে বৃক্ষ-শ্রেণী সবই প্রশস্ত। অঞ্চলটা নিরিবিলি, দুপাশে অভিজাত সম্প্রদায়ের সুপরিকল্পিত প্রাসাদরাজি। রাস্তা গিয়ে মিশেছে বুলোন বনে (Bois de Boulogne)—অনেকখানি জায়গা নিয়ে ছায়াঘন উদ্যান। আঁভেন্যু শঁসেলিজে (Champs-Elyse'es) শহরের প্রসিদ্ধতম রাজপথ, দুপাশের সুউচ্চ গাছের ছায়ায় এই সরল প্রশস্ত রাস্তা অতি সুন্দর দেখায়।

একদিকে চোখে পড়ে শুভ্র জয়তোরণ, অন্যদিকে প্লাস দ্য লা কঁকর্ড (Place de la Concorde)—প্রকাণ্ড চক্রাকার এক মিলনকেন্দ্র, সন্ধ্যায় অগণ্য আলোর মেলায় উজ্জ্বল। ফরাসী বিপ্লবে এইখানে উন্মত্ত জনতার সামনে গিলটিন খড়্গের নিচে মাথা হারিয়েছিলেন মারি আঁতোয়ানেৎ, রোব্‌সপিয়ের ও অন্যান্য হতভাগ্যরা। এখান থেকে সুন্দর দেখা গেল সেইন (Seine) নদীর পারে ফরাসী পার্লামেণ্ট গৃহ। সেইন টেম্‌স-এর মত ঘোলাটে নয়, তার সেতুগুলিও লণ্ডনের চেয়ে অনেক সুদৃশ্য। নদীর আশেপাশে দেখবার আছে অনেক কিছু। পুরনো ত্রোকাদেরো (Trocade'ro) থিয়েটারের ভূমিতে গড়া হয়েছে শিল্প ও বিজ্ঞানের এক আধুনিক যাদুঘর, এই শুভ্র গৃহের স্থাপত্য অভিনব ও চমকপ্রদ। নদীর ওপারে, জ্যামিতিক নক্‌শা-সম্মত উদ্যান পেরিয়ে উত্তুঙ্গ আইফেল মিনার (Eiffel Tower), এক হাজার ফুট দীর্ঘ। লিফ্‌ট দিয়ে চড়া যায় বিভিন্ন স্তরে, তাছাড়া সিঁড়িও আছে। উপরে শহরের ভূগোল চোখের সামনে বিস্তৃত মানচিত্রের মত; জয়তোরণ, ত্রোকাদেরো, অ্যাঁভালিদ (Invalides), পুণ্যপ্রাণ গির্জা (Sacre'-Cœur) ইত্যাদির শুভ্র মূর্তি দুপুরের রোদে জ্বলজ্বল করছে; আঁকাবাঁকা সেইন নদী এবং সেতুমালার সমস্ত সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত। সেই শোভা দেখতে দেখতে উপরিস্থিত রেস্তরাঁয় খাওয়ার কাজটা

সারা গেল। খাদ্যের মূল্য রেস্তরাঁর মতই গগনস্পর্শী হবে ভয় করেছিলাম, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তা হল না।

নদীর বাম তীর বা ল্যাটিন অঞ্চলের আছে এক নিজস্ব খ্যাতি। এই আদি প্যারিসের আঁকাবাঁকা পথঘাট এবং বিচিত্র ঘরবাড়ির আশেপাশে পুরনো বই এবং প্রাচীন আসবাবপত্র টুকিটাকি ইত্যাদির দোকান। এ যেন প্যারিসের মস্তিষ্ক,—ছাত্র শিল্পী ভাবুক এবং বিবিধ খেয়ালী দলের ঘাঁটি এ পাড়ায়। বিশ্বশিল্প ও সাহিত্যের অনেক নতুন ধারার সূত্রপাত ও বিবর্তন হয়েছে এখানকার কাফের আলোচনায়। কাফে দ্য ফ্লোর এর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। বুলেভার স্ত্যাঁ মিশেল (Saint Michel) বাম তীরের বড় রাস্তা। বিখ্যাত সরবন (Sorbonne) বিশ্ববিদ্যালয় এখানে অবস্থিত।

অ্যাঁভালিদ নামক বাড়িটি আগে ছিল হাসপাতাল, এখন নেপলিয়ন, ফক প্রভৃতি অনেক রণনেতার সমাধি-মন্দির। মাঝখানের এক গম্বুজকে ঘিরে বৃত্তাকার গঠন। জানলায় নীলাভ কাঁচ, তার আলো ঘরে এক অভিনব পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। কালো পাথরের বেদীর উপরে অনেকটা নৌকার মত গঠিত গাঢ় বাদামী রঙের এক বৃহৎ শিলাপাত্র; তার ভিতরে একের মধ্যে এক অনেক শবাধারের অন্তরস্থলে নেপলিয়নের দেহ।

শহরের দক্ষিণাংশে ঐতিহাসিক মঁমার্ত্র্ (Montmartre) 'পর্বত'। চূড়ায় অনেকটা তাজমহলের মত দেখতে এক শুভ্র মন্দির প্যারিসের আধ্যাত্মিক মুকুটের মত বিরাজ করছে। এই 'পুণ্যপ্রাণ গির্জা' স্থাপত্যের জন্য বিখ্যাত। এর পিছন দিকটা উপরোক্ত ল্যাটিন অঞ্চলের মত এক বোহিমিয়ান পল্লী। কিন্তু আধুনিক প্যারিসে নৈশ প্রমোদকেন্দ্র হিসেবেই মঁমার্ত্র্ প্রধানত বিখ্যাত। বহু উৎকৃষ্ট নাচঘর, রঙ্গালয় ইত্যাদির ছড়াছড়ি এখানে।

নদীর এক ক্ষুদ্র দ্বীপে নোত্র দাম (Notre Dame) গির্জা গথিক স্থাপত্যের নিখুঁত নিদর্শন। জানলায় নক্সাকাটা রঙিন কাঁচের কারুকাজ অনবদ্য। গির্জার বহিঃপ্রাঙ্গনে এক চিহ্নিত জায়গা হল শহরের সরকারী কেন্দ্রস্থল। প্যারিসের পত্তন হয় এই দ্বীপে।

বেড়াতে বেড়াতে খিদে পাচ্ছে খুব, কিন্তু খাওয়া এক সমস্যা। একবার এক রেস্তরাঁয় দুপুরের আহারের জন্য দুজনে মিলে দিতে হল চারশো ফ্রাংক—প্রায় এক পাউণ্ড। যে পঁচাত্তর পাউণ্ড নিয়ে বেরিয়েছিলাম ইংলণ্ড থেকে তার খুব বেশী আর বাকি নেই। অনেক হিসেব করে বেছে বেছে খাই। এযাবৎ যত দেশ ঘোরা হল তার মধ্যে খাদ্যের দাম এখানেই সবচেয়ে বেশী। আরো লক্ষ করলাম যে খাদ্যের অভাব আছে, কিছুটা বাঁধাবাঁধিও

আছে, কিন্তু জোড়াতাড়া দিয়ে ছয় পাত্রের ভোজ এরা প্রায়ই পরিবেশন করে। প্রধান ব্যঞ্জনের আগে সুপ এবং ওডাভ (hors d'œuvre) তো আছেই, পরেও হয়তো শীম-বিচি সিদ্ধ বা ঐ রকম কোনো সবজির থালা সাজিয়ে দেবে। এটা বোধহয় এদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ; ইটালীয়রা যেমন খাবার শেষে কাঁচের পাত্রে বরফ-জলে ডুবিয়ে এনে দিত ফল, অথবা মাংসের সঙ্গে দিত এক টুকরো লেবু ; অথবা সুইৎসার্লাণ্ডের কফির মধ্যে যেমন সর্বদা দুধের ভাগ থাকত বেশী।

এক রাতে খাওয়াদাওয়ার পর এক ভ্রমণ বাসের দলে ভীড়ে বেরোলাম 'নৈশ প্যারিস' দেখতে। দশটার আগে নৈশ জীবন ঠিক আরম্ভ হয় না। বাসের প্রথম গন্তব্য এক নিচুদরের কাফে। পথে আমাদের গাইড সে জায়গাটার এক ভয়াবহ ও রোমাঞ্চকর চিত্র আঁকলেন নাটকীয় ভাষায় : ঠগ আর জুয়াড়ীর ঘাঁটি··· যৌন বিকৃতির খেলা···গুলি ও ছোরা-ছুরি চলছে হামেশা। অবশেষে এক সরু গলির মধ্যে ছোট দরজা দিয়ে এক ধূমাক্ত আধঅন্ধকার ঘরে ঢুকলাম। গ্রামোফোনে কর্কশ নাচের বাদ্য বেজে উঠল, লোক যারা বসে ছিল তারা উঠে নাচতে আরম্ভ করলে ; কোথাও•কোথাও দুটি পুরুষে বা দুটি মেয়েতে জুড়ি হয়েছে। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে আসবার সময় লক্ষ করলাম সঙ্গে সঙ্গে নাচগানও বন্ধ হল।

অতঃপর আমাদের নিয়ে গেল নদীর বাম তীরে আরেকটি কাফের নিচে ভূগর্ভের এক প্রকোষ্ঠে। আগে নাকি জায়গাটা ছিল কারাগার,—উপরে ছিল এক মঠ। উনিশ বছরের এক বন্দী ছেলে এখানে মারা যায়, তার একটি শয়ান মূর্তি দেখলাম ছোট্ট এক ঘরে। আরেক ঘরের মাঝখানে অদ্ভুত ধরণের একটি সংকীর্ণ কূপ। সর্বত্র রুক্ষ দেয়াল খসে খসে পড়ছে, নিচু গোল-করা ছাত, সরু প্যাঁচানো সিঁড়ি। আমাদের সামনে এক গ্লাস করে সাইডার রেখে গেল। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ফরাসী ও ইংরেজী দুখানা গান গাইলে। গাইড বলেছিল এ ধরণের জায়গা সাধারণত ছাত্রদের আড্ডা, কিন্তু সেরকম কিছু দেখলাম না।

এর পরে হানা দিলাম যেখানে সে জায়গাটা অপেক্ষাকৃত সম্ভ্রান্ত। মাঝখানে খানিকটা জায়গা ঘিরে গোল করে আসন সাজানো। এখানে জুটল শ্যাম্পেন; নানাধরণের নাচ ও ব্যঙ্গরচনা চলল কিছুক্ষণ। প্রধান আকর্ষণ ফরাসীদের বিখ্যাত আপাশে (Apache') নৃত্য। এই নাচের বিষয়বস্তু এইরকম: এক শয়তান ব্যক্তি তার সঙ্গিনীর থেকে পয়সা আদায়ের চেষ্টায় তার উপর নির্দয় অত্যাচার করছে,—কখনো মারছে, কখনো দূরে ছুঁড়ে ফেলছে; ক্রমে মেয়েটির সমস্ত সহ্যশক্তি নিঃশেষিত হল, তার যথাসর্বস্ব দিয়ে দিতে বাধ্য হল সে। তখন তার অর্ধমৃত দেহটি তুলে নিয়ে চলে গেল দুশ্‌মন।

মোটামুটি রাত দেড়টা পর্যন্ত সেদিন মন্দ কাটল না, কিন্তু বাস কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্ক সেখানেই শেষ করলাম।

প্যারিসের রঙ্গজগতের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ জগতবিখ্যাত ফোলি বেরজ্যের (Folies Bergères) সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান। অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ এক সাধারণ রাস্তায় অবস্থিত রঙ্গালয়, বাইরে নেই খুব আলোর চাকচিক্য। তালিকায় ছিল নানা বৈচিত্র্যের মেলা—ব্যালে নৃত্য, গান, রসাভিনয়, এমন কি দৈহিক ব্যায়ামের কসরৎ পর্যন্ত। অনেক কিছুতেই অবশ্য সেই ফরাসী রসের ছোঁয়া যা বিজাতীয়দের চোখে সাধারণত কিঞ্চিৎ অশ্লীল; ইংরেজরা বলবে naughty। বাছা বাছা সুন্দরী নটীরা তাদের দেহসৌষ্ঠব প্রায় সম্পূর্ণ উন্মোচন করছে এই কারণেও এই প্রতিষ্ঠান অপবাদ বা সুবাদ অর্জন করেছে। অনেকে অবশ্য ঐ আকর্ষণে যায় সেখানে, কিন্তু অনুষ্ঠানের শেষে আমাদের এই ধারণাই হল যে এর মধ্যে ওটা প্রধান জিনিস নয়। এর মধ্যে সত্যিই আছে প্রকৃত শিল্পীর হাত এবং—সবচেয়ে যা আশ্চর্য—শিল্প পরিবেশনের ধরণ বা টেকনিক বিস্ময়বিমূঢ় করে দেয়। মঞ্চসজ্জা ও দৃশ্যপটের পরিকল্পনা যেমন বিরাট ও জটিল, তাদের পরিবর্তনও তেমনি দ্রুত। এক দৃশ্যে ট্রেন চলে গেল ধোঁয়া উড়িয়ে; দৃশ্যান্তরে দেয়ালে টাঙানো প্রকাণ্ড ছবির মধ্যে লোকজন নড়াচড়া করলে, কথাবার্তা বললে। বাস্তবতা ক্ষুণ্ণ হল না কোথাও বিন্দুমাত্র।

নৃত্যানুষ্ঠানগুলিই অবশ্য সবচেয়ে উপভোগ্য ও মৌলিক এবং এরই পরিকল্পনায় ও অভিব্যক্তিতে এই প্রতিষ্ঠানের স্বকীয় প্রতিভার বিকাশ। এমন বিস্ময়কর ও মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠান আর কখনো দেখিনি।

প্যারিসে পয়সা অবশ্য জলের মত খরচ হয় কিন্তু এই ধরণের রঙ্গালয়ে যতটা দ্রুতবেগে এমন আর কোথাও নয়। প্রেক্ষাগৃহে ঢুকবার পথে নানারকম ছবি, পুতুলমূর্তি ইত্যাদির হাট বসে গেছে। ঘরে ঢুকবার পরে বসবার জায়গা দেখিয়ে দিয়ে সুন্দরী তরুণী হাত পাতলে বকসিসের জন্য। মাধ্যমিক বিরতির সময় বাইরে এসে দেখি ঐ কয়েক মিনিটের জন্য ভূগর্ভের এক ক্ষুদ্র রঙ্গালয়ে হচ্ছে 'প্রাচ্য নৃত্য'। তার জন্য অবশ্য আলাদা টিকিট, কিন্তু এদের প্রাচ্য-নৃত্য দেখবার লোভ সামলাতে পারলাম না। তিনটি যৌবনোত্তীর্ণা ঈষৎস্থূলাঙ্গিনী ফরাসী ললনা একের পর এক কিছুক্ষণ মঞ্চের উপর হাত মাথা উদর ও নিম্নাঙ্গ সঞ্চালন করে গেল। এদের যৌবন অস্তোন্মুখ, বোধহয় সেই অপরাধে উপরের মঞ্চের থেকে এই ভূগর্ভে অধঃপতিত হয়েছে; অনুষ্ঠানেরও পার্থক্য আকাশ পাতাল। শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে যাবার তিনটি দরজার সামনে তারা টুপি পেতে ধরলে, কয়েক ফ্রাংক দিতে হল সেখানে।

পরে এক সন্ধ্যায় মঁমাত্র্ অঞ্চলের বিখ্যাত কাবারে বাল

তাবারঁ্যা-তে (Bal Tabarin) অনেকটা এই ধরণেরই অনুষ্ঠান দেখলাম ; যদিও সেখানে পরিকল্পনা নয় এত চতুর, নয় এত বিশাল। জায়গাটা অবশ্য ঠিক রঙ্গালয় নয়—নাচঘর। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সুসজ্জিত নরনারীর দল পানাহারের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের নাচ দেখছে। মাঝে মাঝে শূন্য মঞ্চ নেমে আসছে ঘরের মেঝের সমান স্তরে, তখন শুরু হচ্ছে দর্শকদের নাচের পালা। কিছুক্ষণ পরে তারা নিজের নিজের আসনে ফিরে এসে বিশ্রাম করছে, আবার শুরু হচ্ছে মঞ্চের নাচ। এই পর্ব চলল প্রায় ভোর পর্যন্ত। চার দল নটীতে মিলে নাচল কংকন (Cancan) নৃত্য ; এই বিখ্যাত নৃত্যেই নাকি এ গৃহের স্বকীয় প্রতিভার প্রধান বিকাশ।

প্যারিস শুধু ফ্যাশানের রাজধানী নয়, আধুনিক আর্টের তীর্থক্ষেত্র—বিশেষত চিত্রকলায়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে প্যারিসে কয়েকবছর কাটানো মার্কিন সাহিত্যিকদের শিক্ষার প্রায় অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চিত্রশিল্পীরা এখনো সারা পৃথিবীর থেকে আসে এখানে শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে। বহু জগতবিখ্যাত শিল্পীর আওতায় প্যারিসে প্রথম কিউবিজ্‌ম ফোভিজ্‌ম সুরিয়ালিজ্‌ম ইম্প্রেশনিজ্‌ম এক্সপ্রেশনিজ্‌ম ইত্যাদির জন্ম হয়েছে, নানাবিধ ধারা সম্বন্ধে পরীক্ষা চলেছে ও এখনো চলছে। এদের এই 'অ্যাবস্ট্রাক্ট' আঙ্গিকের বহুমুখী

তরঙ্গ আজকাল প্রায় সব দেশের সব শিল্পীকেই অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত করেছে এবং চিত্রে ও ভাস্কর্যে সনাতন বাস্তবিকতাকে দিয়েছে পিছনে ঠেলে।

লুভ্‌র্‌ (Louvre) মিউজিয়ামের বিচিত্র মেলায় আছে ঐ শেষোক্ত ধারার বহু নিদর্শন। এক বারান্দার প্রান্তে ছোট কক্ষে একাকিনী বিরাজ করছেন ভেনাস ডি মিলো (Venus de Milo)। সদ্যপ্রস্ফুটিত কৌমার্য নয় এর—বরং পরিণত যৌবনের সৌন্দর্য। নাতিশীর্ণ কটি ও ক্ষুদ্রাকৃতি স্তন পৌরাণিক গ্রীক শিল্পরুচি এবং ভারতীয় আদর্শের মধ্যে পার্থক্য উচ্চারিত করেছে। চিরযৌবনা ভেনাসের ত্বক আজ স্থানে স্থানে খসে পড়ছে। দা-ভিঞ্চি অঙ্কিত মোনা লিজা-র (Mona Lisa) প্রতিকৃতি এই মূর্তির চেয়ে কম খ্যাত নয়; এক সূক্ষ্ম হাসির মধ্য দিয়ে নাকি একটি নারীজীবনের সমগ্র অভিজ্ঞতার ইতিহাস অঙ্কিত হয়েছে। দেখলাম সেই ছবি—লাল মখমলের পটে রক্ষিত। এছাড়া আছে রুবেন্‌স (Rubens), ভ্যান ডাইক (Van Dyck), রেম্‌ব্রাণ্ট্‌ (Rembrandt) প্রমুখ বহু য়োরোপীয় শিল্পীর চিত্রসম্ভার। রুবেন্‌স-এর চিত্রাবলীতে প্রকৃতির নব নব কাব্যময় মূর্তি বিশেষ করে মুগ্ধ করলে।

এই মিউজিয়ামের বাইরে রু্য দ্য রিভোলি (Rue de Rivoli) অতি মনোরম রাজপথ। একপাশে প্রশস্ত ঢাকা

ফুটপাথ বা 'আর্কেড'। সন্ধ্যায় আলোর সজ্জা চমকপ্রদ। হ্যাঁ, সবশুদ্ধ নাগরিক সৌন্দর্যে প্যারিস অন্যান্য দেশের অনেক শহরকে হার মানাবে। পৃথিবীর বৃহত্তম শহর লণ্ডনের চেয়ে এর উদ্যান নদী ছায়াঢাকা পথ ইত্যাদি অনেক সুন্দর। কিন্তু বাসব্যবস্থার আধুনিক সুখসুবিধার দিকে হয়তো লণ্ডন শ্রেয়। প্যারিসের সুরঙ্গ রেল অপেক্ষাকৃত অপরিষ্কার, অসুন্দর ও ধীর,—চলাচলে নেই লণ্ডনের মত মসৃণ নিয়মানুবর্তন। একতলা বাসগুলিও মোটেই আরামদায়ক নয়। কিছুটা দৈন্যদশা হয়তো গত যুদ্ধের ফলে : এ কথা আরো মনে হয়েছে ফ্যাশানের বা প্রমোদের কেন্দ্র হিসেবে এ শহর সম্বন্ধে আগে যা শুনেছি তার কথা স্মরণ করে। প্যারিস নাকি পৃথিবীর রাজধানী, কিন্তু আজকের এই নিওন-নাইলন সভ্যতার জগতে রাজধানীর চাকচিক্য যেন নেই যথেষ্ট,—যথেষ্ট নেই গানবাজনা, প্রমোদোল্লাস, রঙিন আলোর বন্যা, পোশাক পরিচ্ছদের পারিপাট্য।

প্যারিস থেকে ভের্‌সাই (Versailles) বাসে ৪৫ মিনিটের পথ। সেখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য চতুর্দশ লুই (Louis XIV) নির্মিত প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ; চতুর্দিকে প্রশস্ত উদ্যান ও পুষ্করিণীর সারি। একদিকে একটি কমলা কানন (orangerie), তাতে কমলালেবু ও পামজাতীয় অন্যান্য গাছ বহু বৃহৎ ভাণ্ডে

রক্ষিত। এগুলি দিয়ে উৎসবের দিনে প্রাসাদের বিখ্যাত মুকুর কক্ষ (Hall of Mirrors) সাজানো হত। এই ঘরে একপাশে গবাক্ষশ্রেণী, তার মুখোমুখি সতেরটি প্রকাণ্ড দর্পণ। এখানে প্রসিদ্ধ ভের্সাই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল, এবং সম্প্রতি ইংলণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জ সম্বর্ধিত হয়েছিলেন। কক্ষান্তরে দেখলাম কারুকার্যখচিত ছোট এক টেবিল,—স্বাক্ষরের সময় সন্ধিপত্র এরই উপরে রক্ষিত ছিল। ঘরে ঘরে নানাবিধ বিচিত্র আসবাবপত্র চিত্র সজ্জাদ্রব্য অলংকার ইত্যাদি। পাশের এক গ্যালারিতে আছে বহু ঐতিহাসিক আলেখ্য ও মূর্তি।

দিন এবং পয়সা ফুরিয়ে এল। অতঃপর একদা দুপুরের আগে ট্রেন ধরে, বুলোন ও ফোকস্টোন হয়ে লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া স্টেশনে এসে নামলাম—ঠিক বারো ঘণ্টা পরে।

ওএল্‌স

ইংলণ্ড ও ওএল্‌স অবশ্য একই ক্ষুদ্র দ্বীপের অন্তর্গত, কিন্তু দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ তীক্ষ্ণ বিবিধ ক্ষেত্রে। ভাষা, আচার উৎসব, জাতীয় পোশাক ইত্যাদিতে ওএল্‌সবাসীদের যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল আজ হয়তো তা ম্রিয়মাণ, কিন্তু সাধারণ লোকের স্বভাব ও ধাত এখানে যে ইংরেজদের থেকে বিভিন্ন তা স্পষ্ট বোঝা যায় এদের কথাবার্তায় এবং ব্যবহারে। সেটা অবশ্য খুব আশ্চর্য নয়, কারণ ঠিক এই শ্রেণীর পার্থক্য—যদিও হয়তো এতখানি উচ্চারিত নয়—দেখা যায় ইংলণ্ডেরই বিভিন্ন কাউন্টি বা বিভাগের মধ্যে।

ওএল্‌সের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও সম্পদ তার প্রকৃতি—বিশেষ করে উত্তরাংশের। ইংলণ্ডের ঢেউখেলানো প্রান্তরের ও পল্লীর এক নিজস্ব মনভোলানো মায়া আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু উত্তর ওএল্‌সের পাহাড় নদী নির্ঝর সমুদ্র অরণ্য পুরনো দুর্গ ইত্যাদির সৌন্দর্য সব মিলিয়ে অনেক বিচিত্র, অনেক প্রগল্‌ভ। ওএল্‌সে প্রকৃতি তার স্বাভাবিক বন্য রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে ; সেজন্য

সে শুধু মন ভোলায় না, বিস্ময় উদ্রেক করে—বিরাটের মুখো-মুখি হওয়ার বিস্ময়। কিন্তু এ দেশ আধুনিক যন্ত্রসভ্যতায়, আর্থিক সচ্ছলতায় এবং বাসব্যবস্থায় ইংলণ্ডের পিছনে পড়ে আছে; বোধহয় সেই কারণেই সম্ভ্রান্ত পর্যটকদের—এবং বিশেষত ভারতীয়দের—পায়ের ধুলো এ অঞ্চলে বড় একটা পড়ে না। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়—কারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা ছেড়ে দিলেও ওএল্সীয় জীবনের আপেক্ষিক অকৃত্রিমতা ও সারল্য বিদেশীর মনে আনে এক নতুনত্বের স্নিগ্ধ ছোঁয়া। উপরন্তু, এদেশে বেড়ানো সম্ভব অপেক্ষাকৃত স্বল্প ব্যয়ে।

মধ্য ইংলণ্ডের শ্রুসবেরি (Shrewsbury) শহর থেকে ট্রেন ধরে এক রৌদ্রালোকিত গ্রীষ্মের প্রভাতে উত্তর ওএল্সে প্রবেশ করলাম। তারপর রুআবন (Ruabon) স্টেশনে নেমে ধরতে হল ছোট লাইনের গাড়ি। এই ট্রেন এবং পথের ছোট ছোট ঘুমন্ত স্টেশনগুলি দেখে আমাদের দার্জিলিঙের রাস্তা মনে পড়ে। গাছপালায় ঘেরা নীল পাহাড়ের মধ্যে স্নিগ্ধ সবুজ উপত্যকার উপর দিয়ে ধীরেসুস্থে চলছে গাড়ি, পাশে পাশে চলেছে প্রসিদ্ধ ডী (Dee) নদী। প্রথম দিকে তার অগভীর জলের অপ্রশস্ত রেখা চঞ্চল পায়ে পাথরের পর পাথর ডিঙিয়ে ছুটেছে যেন কী এক বিশেষ তাগিদে; তারপর সে ছড়িয়ে পড়ল, শান্ত হল—এঁকেবেঁকে চলল ধীরপায়ে, আনমনা

ভঙ্গিতে। ছোটনদী যে এত মনোরম হতে পারে আগে তা জানতাম না। মুহুর্মুহু তার নতুন রূপ! কখনো দুপাশে ঘন গাছের শ্রেণী হাত বাড়িয়ে জল স্পর্শ করছে; কখনো ঘাস-ঢাকা রৌদ্রঘেরা উন্মুক্ত ঢালু মাঠের বুক চিরে চলেছে সে। ঘরবাড়ি অনেক দূরে দূরে, সাড়াশব্দ নেই কোথাও। ঘোড়া গরু ভেড়া শুয়োর ইত্যাদির অলস বিহার এদিকে ওদিকে। নীল আকাশ, তাতে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘের শ্লথ, উদ্দেশ্যহীন গতি। মেঘের ছায়া ভেসে গেল পাহাড়ের গা বেয়ে, ছবির মত এক কুটিরের প্রাঙ্গন ছুঁয়ে। অনেক দূরে কে একজন স্থির হয়ে বসে আছে নদীর জলে ছিপ ফেলে; আরো দূরে ডাকল গরু প্রলম্বিত তন্দ্রালু সুরে। চতুর্দিকে আকাশে বাতাসে শুধুই প্রকৃতির পরম ঔদাস্য। বাচ্চা নিয়ে পশু যেমন নিশ্চিন্ত আলস্যে তন্দ্রামগ্ন হয়, পৃথিবীর প্রাণীদের নিয়ে প্রকৃতি তেমনি আবিষ্ট। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই যে ইংলণ্ডের কোলাহল জনতা ব্যস্ততা কৃত্রিম সভ্যতার মধ্যে ছিলাম এ এখন আর বিশ্বাস করা কঠিন। টেলিগ্রাফের তার পর্যন্ত চোখে পড়ে না কোথাও।

এই ডী নদীর পারে পারে বিখ্যাত ওএল্‌সীয় গীতিকাব্যের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। এই পরিবেশে গড়ে ওঠে যার মন তার পক্ষে কবি হওয়াই বোধহয় সবচেয়ে সহজ। সেই কোনকালে পড়েছিলাম The Miller on the Dee, আজো মনে পড়ে

তার আশ্চর্য শিহরণ। আজো এই উর্বর ভূমিতে জন্ম নিচ্ছে নতুন নতুন কাব্যপ্রতিভা।

এদেশের লোকে যে গানের সুরের মত এক বিশেষ রেশ টেনে কথা বলে তার সঙ্গে ইতিপূর্বে পরিচয় হয়েছিল চলচ্চিত্রের মারফৎ, এখন থেকে শুনতে আরম্ভ করলাম সেই সুর। কামরায় আমরা তিনজন ভারতীয় ছাড়া আর দুজন যাত্রী—এক ওএল্‌সীয় প্রৌঢ় ও এক ইংরেজ যুবক। কথা শোনার পর কাউকেই আর জিজ্ঞাসা করতে হল না দেশ কোথায়। ঔৎসুক্যের তাড়নায় আমরা প্রৌঢ়কে ব্যতিব্যস্ত করছি নানা প্রশ্নে—সংক্ষিপ্ত ঈষদনির্দিষ্ট তার জবাবে ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারছি না। অবশেষে এক স্টেশনে ইংরেজটি নেমে যেতে মুখ খুলল তার। তাড়াতাড়ি জানালেন যে ওদের সামনে সাবধান হতে হয় এদেশের লোকের,—এমনই ইংরেজের আত্মম্ভরিতা যে ইংলণ্ডের বহির্ভূত কোনো কিছুর প্রশংসা সহজে তারা বরদাস্ত করতে পারে না। “তোমরা বেশ করেছ ইংরেজকে ভারত থেকে দূর করে,” বললেন তিনি, “আমরাও যদি তা পারতুম তো ভাল হত। এ দেশটা তো ছিল আমাদেরই, ওরা উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। আমাদের পূজা পার্বণ সবই ছিল নিজেদের; এখনো জাতীয় উৎসবের দিনে আমরা নিজস্ব পোশাকে সাজি। ইংরাজিয়ানা এসে নষ্ট

করেছে সব, সব-কিছুতেই ওরা জাহির করতে চায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব।”

আমরা ভারতীয় বলে হয়তো ভদ্রলোক অতিমাত্রায় ইংরেজ-বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু সে যাই হক তার সঙ্গে অন্যান্য আলাপে তৃপ্তি এবং তথ্য দুইই আহরণ করা গেল। একটু পরপরই আসছে এক একটি ঘুমন্ত স্টেশন—কাঠের স্বল্প প্লাটফর্ম, তার পিছনে ছোট্ট কাঠের ঘর। স্টেশনের দাঁতভাঙা নাম পড়তে চেষ্টা করছি, উনি শিখিয়ে দিলেন উচ্চারণ: যথা Glyndyfrdwy-কে পড়তে হবে গ্লিন্‌ডাফর্ডি, অর্থ—জোড়া নদীর উপত্যকা। এমনি আরো অনেক নাম ও তার অর্থ শেখা গেল।

বনের ছায়ায় ঘেরা প্রকাণ্ড এক হ্রদ, নাম বালা (Bala)। আড়াই মাইল ধরে সে চলল আমাদের পাশাপাশি। তারপর মো (Mow) নদী, অগভীর কিন্তু প্রশস্ত, একেবারে আমাদের পথের শেষে সাগরে গিয়ে মিশেছে। সিন্ধুবিহগের ডাক শুনে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি দূরে উন্মুক্ত নীল সমুদ্র, দুপুরের খর রোদে চিকচিক করছে। সেখানে বারমুথ (Barmouth) শহর; ট্রেন ত্যাগ করে ওখান থেকে বাস আমাদের বাহন। ওএল্‌সের পল্লীগ্রামেরও আনাচে কানাচে গেছে বাস।

ট্রেনের ঝাঁকানি ও সমুদ্রের হাওয়ায় খিদে উঠেছে চনচন

করে, কিন্তু উপকূলের কোনো রেস্তরাঁয় এক কণা বালি ধারণের স্থান নেই। সর্বত্র ছুটির ভীড়; ছেলে বুড়ো, মেয়ে পুরুষ; চাঞ্চল্য আর আনন্দের ঢেউ; খেলা আর খেয়ালের মেজাজ। কিছু ঘোরাঘুরি ও অপেক্ষার পর অবশেষে জায়গা পাওয়া গেল। দুর্ভিক্ষপীড়িত ইংলণ্ডে যা খেয়ে এসেছি আহার্য অবশ্য তার চেয়ে উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু জানলা দিয়ে সমুদ্র দেখতে দেখতে খাওয়ার তৃপ্তি বেশী।

তারপর বেলাভূমির বালির শয্যায় বিশ্রাম। আশেপাশে প্রকাণ্ড রঙিন ছাতার নিচে বহু পরিবারের ভীড়; বড়রা পড়ছে বা চোখ বুঁজে আছে, ছোটরা ছুটছে, বালি খুঁড়ছে, আইসক্রীম কিনছে। স্নানামোদীদের সংখ্যা বেশী নয়, জল বেশ ঠাণ্ডা। সমুদ্র শান্ত।

সেখানে থেকে বাস বিকেলের দিকে আমাদের পৌঁছে দিল হার্লেখ-এ (Harlech)। এও সমুদ্রপারের ছোট শহর, কিন্তু তীরে তট বা beach নেই। এখানে প্রধান আকর্ষণ ধ্বংশপ্রাপ্ত এক দুর্গ, ১২৮১ সালে তৈরি। অলিন্দে ও প্রকোষ্ঠে আগাছা আর অন্ধকার, কিন্তু উন্মুক্ত দোতলার থেকে সমুদ্রের রূপ চমৎকার দেখা যায়।

চায়ের পর আবার বাস নিলাম পোর্ট ম্যাডক (Port Madoc) লক্ষ করে। অতি সুন্দর পাহাড়ী রাস্তা,—একপাশে

গভীর খাদ, অন্যদিকে উত্তুঙ্গ গিরিপ্রাচীর। হঠাৎ পাওয়া গেল ডী-র মত এক ছোটনদী। একবার গাড়ি বদল করে গন্তব্যে পৌঁছালাম সন্ধ্যার আগেই; গ্রীষ্মের দিনে তখন অবশ্য নটার আগে সন্ধ্যা হয় না। প্রথমে দরকার রাত্রিনিবাস। কিন্তু হোটেল দুতিনটে যা ছিল তাতে স্থান নেই। অনেক বাড়ির সামনে শয্যা-ও-প্রাতরাশের বিজ্ঞাপন, একের পর এক কড়া নেড়ে চলেছি, গৃহকর্ত্রীরা দোর খুলে জানান—জায়গা নেই; কারো কারো মুখের ভাবে মনে হয় তিনটি কালামূর্তি দেখে চমকে উঠছে, ভয় পাচ্ছে। পথেঘাটে অনেকে তো স্পষ্ট বিস্ময়ে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন ঠিক ঠাহর করতে পারে না কোন দেশের লোক। বোঝা যায় ভারতীয় এরা বড় একটা দেখে নি ওএল্‌সের অন্তর্দেশে।

অবশেষে বাক্স বয়ে বয়ে হাত যখন ছিঁড়ে পড়ছে এমন সময় আশ্রয় দিলেন এক সহৃদয়া গৃহিণী। সন্দেহ ও সংকোচ তারও ছিল স্পষ্টই কিন্তু আমাদের শুষ্ক মুখের ক্লান্তি আর নৈরাশ্য বোধহয় তার নারী-প্রাণে ঘা দিল। ঘরগুলি ভালই, কিন্তু বাড়ীতে নেই স্নানঘর; আর, পিছন দিকের এক ওঠোন পেরিয়ে অন্ধকার নিচু ঘরে খাটা পায়খানা—দেখে আমাদের পাড়াগাঁয়ের কথা মনে পড়ে। ইংলণ্ডের তুলনায় অবাক লাগে আরো বেশী।

হাতমুখ ধুয়ে খেতে বেরোলাম। দোকানপাট প্রায় সব বন্ধ, রাস্তায় লোকজন বেশী নেই, যদিও তখনো আলো রয়েছে আকাশে। এক রেস্তরাঁয় জুটল সিদ্ধ কলাইশুটি সহযোগে আলুভাজা,—জিনিসটা যেন ইংলণ্ডের আলু-মাছভাজার এক দরিদ্র সংস্করণ। যে বালিকাটি আমাদের খাবারের থালা সাজিয়ে দিল তার সলজ্জ নির্দোষ মুখভাবেরও তুলনা চলে না সাধারণ লণ্ডন-পরিবেশিকার চেহারার সঙ্গে।

পোর্ট ম্যাডক ক্ষুদ্র ঘুমন্ত বন্দর। বন্দরে পাহাড় ঘেরা অগভীর শান্ত সমুদ্রের বুকে ছড়িয়ে আছে নানারকমের ছোট জাহাজ আর নৌকা। শেলি নাকি এখানে কাটিয়েছিলেন কিছুদিন।

অন্ধকার হল। নির্জন পথে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ঘরে ফিরে এলাম। আমাদের গৃহকর্ত্রী মিসেস জোন্‌স সেই যে বিকেলে দরজা খুলে দিয়েছিলেন তারপর আর তার দেখাই পাই নি,—ভাবলাম ছেলেমেয়েদের আগলে নিয়ে হয়তো ঘরে খিল দিয়ে বসেছেন। খোঁজ করে কিন্তু তাদের পাওয়া গেল; দেখলাম সংকোচ অনেকটা কেটে গেছে, আলাপ জমে উঠল। তখনো তারা বুঝতে পারে নি আমরা কোন দেশের লোক; পর্তুগাল, ইটালি, পারস্য, চীন, ইত্যাদি অনেক জায়গাই অনুমান করলে একে একে।

পরদিন সকালে বাসযোগে প্যুলহেলি (Pwlheli) বেড়িয়ে আসা গেল। এখানে সমুদ্র সতেজ, চঞ্চল তরঙ্গভঙ্গ,—এযাবৎ যেমন দেখেছি তেমন নয়। প্রশস্ত বালুতট ও সুদীর্ঘ বিহার-পথ জলের ধারে। ফিরে এসে খাওয়াদাওয়া সেরে কার্নার্ভন (Caernarvon) শহরের দিকে রওনা হলাম। কার্নার্ভন বড় শহর, ওএল্‌সের রাজধানী আগে ছিল এখানে (এখন দক্ষিণে কার্ডিফ-এ স্থানান্তরিত)। পর্বতমালার মধ্য দিয়ে বাসের পথ; একটি ছোট নদী—নাম বোধহয় মেনাই (Menai)—ও হ্রদ দেখে মনে পড়ল ডী উপত্যকার স্মৃতি। দূরে দেখা গেল বিখ্যাত স্নোডন (Snowdon) পর্বত; উচ্চতা ৩,৫৬০ ফুট—ইংলণ্ড ও ওএল্‌সের মধ্যে প্রথম। চূড়ায় একটা ঘর ও রেল-গাড়ির ধোঁয়া চোখে পড়ল।

কার্নার্ভনে পাওয়া গেল ভাল হোটেল। জিনিসপত্র রেখে চা খেয়ে ব্যাংগর (Bangor) যাবার বাস ধরলাম। ব্যাংগর বেশ বড় পাহাড়ী শহর এবং ওএল্‌সের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্র। উপরন্তু জায়গাটা সুন্দর। প্রস্তরনির্মিত বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহ ছোট কিন্তু সুসৌষ্ঠব। সেখানে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে দেখা যায় সমুদ্র, সামনে উপত্যকায় শহরকেন্দ্র এবং তার ওপারে আবার গিরিশ্রেণী। সব মিলিয়ে এক মনোমুগ্ধকর চিত্র! হাঁটতে হাঁটতে গেলাম মেনাই সেতুর কাছে। সামনে কয়েকশো ফুট

নিচে নদীর জলে ভেসে চলেছে মোটরবোট, মালবাহী নৌকা। দক্ষিণে এক প্রণালী, বাঁয়ে অরণ্যাচ্ছন্ন পাহাড়। নদীর ওপারে পাহাড়ের ঢালু গায়ে ঘন গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারছে দুটি একটি কুটির। বেঞ্চিতে বসে চেয়ে থাকতে বেশ লাগল অনেকক্ষণ। সেতুর ওপারে ক্ষুদ্র এক দ্বীপ। এখানে হাঁটতে দার্জিলিঙের ক্যালকাটা রোড মনে পড়ে।

পরদিন সকালে প্রসিদ্ধ কার্নার্ভন দুর্গ দেখতে গেলাম। দুর্গ বোধহয় ১২৫০ সালের কাছাকাছি তৈরি হয়েছিল, বর্তমানে সযত্নে সংরক্ষিত। ছয়কোনা তিনতলা মিনারশ্রেণী—এরই মধ্যে বাসপ্রকোষ্ঠ, উৎসব-কক্ষ ইত্যাদি। গোল সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়, তার মাঝে মাঝে দেয়ালের গা কেটে সরু লম্বা গবাক্ষ। মিনারগুলিকে যুক্ত করেছে প্রশস্ত প্রাচীর, তার উপর দিয়ে এক দিক থেকে আরেক দিকে যাবার পথ। শেক্‌সপীয়রের নাটকাবলীর অনেক দৃশ্য জড়িত যেন এর অন্দরে অঙ্গনে। ভিতরের গঠনব্যবস্থা দেখে আবার সহজেই দিল্লী আগ্রার দুর্গ মনে পড়ে। মিনারের ছাত থেকে সমুদ্র আর পাহাড়ের দৃশ্য চমৎকার।

ওখান থেকে বেরিয়ে এলাম বাসস্টেশনে; উদ্দেশ্য স্নোডন-শিখরে চড়ব। বাস পৌঁছে দেবে আমাদের পাহাড়ের পাদ-দেশে, খ্‌লানবেরিস (Llanberis) গ্রামে। কিন্তু দেখা গেল

গাড়িতে স্থান নেই। দ্বিতীয় বাস ছাড়বে অনেক পরে, তার জন্য অপেক্ষা করতে গেলে আমাদের ভ্রমণ পরিকল্পনার গোলমাল হবার সম্ভাবনা। এক ইনস্পেক্টর সাহেবকে জানালাম সমস্যার কথা। ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ সাহায্য করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, গারাজে টেলিফোন করলেন একটি ছোট বাস পাঠিয়ে দেবার জন্য। শুধু আমাদের তিনজনের জন্য এই পেট্রোল সংকোচের দিনে একটা আলাদা বাস! কৃতজ্ঞতায় চোখ দিয়ে জল আসে আর কি। বাসের জন্য অপেক্ষা করতে করতে ভদ্র-লোকের সঙ্গে ভাল করে আলাপ হল। কথাবার্তা ও ব্যবহার সহজ, সহৃদয়, স্পষ্ট ; সুদীর্ঘ সুদর্শন দেহ ; হাসিতে কাজে বাক্যে সজীব সতেজ লোকটি। খাঁটি ওএল্‌সীয় বা ইংরেজের মধ্যে এই ধাতের লোক দুর্লভ। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল জন্মে ইংরেজ হলেও জীবনের অধিকাংশ তার কেটেছে দূর সাগরপারে—অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা এই সব দেশে।

পাহাড়ের গোড়ায় ট্রেন প্রস্তুত, তার একটি মোটে কামরা। কাঠের বেঞ্চিতে বসবার জায়গা, জানালার বাইরে ত্রিপালের পর্দা। দিনটা ছিল মেঘলা, মাঝে মাঝে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে, তবু যাত্রীতে ভরে গেল গাড়ি। ট্রেন চলল সোজা একেবারে শিখরের দিকে মুখ করে—পাহাড় প্রদক্ষিণ করে এঁকেবেঁকে নয় ; এঞ্জিনের তলপেটে এক দাঁতকাটা চাকা দুই রেলের মধ্যবর্তী

আর এক দাঁতকাটা রেলের খাঁজে খাঁজে বসে, ট্রেন পিছলে পড়তে পারে না। বাইরের দৃশ্য তেমন কিছু চিত্তাকর্ষক নয়। পাহাড়ের রং সবুজ, কিন্তু গাছপালা বা বসতি নেই। মাঝে মাঝে চোখে পড়ল কয়েকটি উৎসাহী ব্যক্তি, কেউ জোড়া কেউ নিঃসঙ্গ,—বর্ষাতিমোড়া দেহে কাঁধে বোঁচকা চাপিয়ে এই বর্ষাপিছল পথে পায়ে পায়ে চূড়ায় উঠছে। এই বিরূপ প্রকৃতির মধ্যে খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাবে এরা, তারপর কাল সকালে আবার চড়া শুরু করবে। কখনো বৃষ্টি নামছে চেপে, পর্দা ভেদ করে ভিজিয়ে দিচ্ছে আমাদের, শীতও বাড়ছে যেন প্রতি মুহূর্তে। অবশেষে একঘণ্টা পরে কাঁপতে কাঁপতে গিরি-শৃঙ্গে পৌঁছানো গেল এবং, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গেল গলাপোড়ানো গরম চা এবং স্যাণ্ডুইচ। আমাদের মত পর্যটকদের জন্যই এই কফিখানা, ট্রেন পৌঁছাবার আগেই এরা সব প্রস্তুত রাখে।

দুপুরে আবার চলা শুরু হল খ্লানডুড্নো-র (Llandudno) পথে। সাগরতীরের এই শহরের সৌন্দর্য বিখ্যাত। পথের সৌন্দর্যও মন মুগ্ধ করলে; শেষের দিকে উন্মুক্ত সমুদ্রের ঠিক পাশ দিয়েই বাসের রাস্তা, রাস্তার অন্য ধারে আকাশস্পর্শী পাহাড়ের প্রাচীর। কনওএ (Conway) শহর রাস্তায় পড়ল,—সেখানে এক দীর্ঘ সেতু ও দুর্গ দৃশ্যকে করেছে আরও রোমাঞ্চকর।

খ্‌লানডুড্‌নো পৌঁছে আবার হোটেল খোঁজার দুর্ভোগ ভুগতে হল। ঘণ্টাকয়েক বাসে চলার ঝাঁকানিতে দেহ ক্লান্ত, সুটকেস হাতে করে দ্বার থেকে দ্বারান্তরে হানা দিচ্ছি, পথের যত লোক বিস্ফারিতনেত্রে তাকাচ্ছে অজানা ভিন্‌দেশীদের দিকে —জায়গা কোথাও নেই। অথচ, দেখে মনে হয়, শহরের শতকরা নব্বইটি ঘরই হোটেল। অবশেষে বেশ চড়া দামে এক হোটেলে একখানা মাত্র ঘর জুটল।

আশ্রয়ের পর দ্বিতীয় চিন্তা আহার। সেটা সেরে বেরিয়ে এলাম সমুদ্রতীরে। সত্যিই মুগ্ধ করে দৃশ্য। দক্ষিণে ও বামে দুই দীর্ঘ পাষাণ-বাহু সমুদ্রের মধ্যে প্রলম্বিত, মধ্যে নীল জল শহরের পায়ের কাছে এসে পড়েছে বেলাভূমিতে। এর ঊর্ধ্বে সুন্দর বেড়াবার রাস্তা। এই পথের এক বাড়িতে প্রসিদ্ধ বই 'আজব দেশে অ্যালিস' (Alice in Wonderland) লিখে-ছিলেন লুইস ক্যারল,—বাড়িটির সামনে এক ফলকে লেখা আছে সে তথ্য। ইনি ছিলেন অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট চার্চ কলেজে গণিতের অধ্যাপক (লুইস ক্যারল তার ছদ্মনাম) এবং কলেজের অধ্যক্ষের কন্যা অ্যালিসের কল্পনা উদ্দীপিত করেছিল তার মনে।

সমুদ্রের ধার দিয়ে ছাতখোলা দোতলা ট্রাম চলেছে। তাতে চড়ে পাঁচ ছ মাইল দূরে কলউইন উপসাগর (Colwyn Bay)

ঘুরে আসা গেল। এ অঞ্চলের সৌন্দর্য প্রসিদ্ধ, কিন্তু তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে এবং বৃষ্টির বেগ বেড়ে চলেছে, সুতরাং সম্পূর্ণ উপভোগ করা গেল না।

আমাদের পরবর্তী লক্ষ এক গ্রাম, নাম বেটিসিকোএড (Bettws-y-co-ed)—সমুদ্র পিছনে রেখে দেশের ভিতরের দিকে। গাইড-বই দেখে এবং জনশ্রুতিতে অন্তত এ ধারণা হয় যে এটিই বোধ হয় ওএল্‌সের প্রসিদ্ধতম গ্রাম। যে মাধুর্য এ দেশের পল্লীগ্রামের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, এ জায়গা নাকি তারই প্রতীক,—যেন ওএল্‌সের অন্তরের এক পোস্টকার্ড-চিত্র ; এবং পর্যটকদের জন্য বিশেষ যত্নে সংরক্ষিত তার মোহন মূর্তি। যাবার রাস্তায় সত্যি বোঝা গেল যে এ দেশের পল্লী-অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করছি। সবুজ উপত্যকার মধ্যে এঁকেবেঁকে বয়ে গেছে ছোট নদী ; কখনো তার পাশ দিয়ে চলেছে বাস, কখনো খেতখামারের মধ্য দিয়ে। কখনো সংকীর্ণ রুক্ষ গ্রাম-পথের দুপাশে মাটির ঘর, কখনো বা কারো কুটির প্রাঙ্গনের উপর দিয়ে অথবা খরস্রোতা নির্ঝরের সাঁকোর উপর দিয়ে রাস্তা।

বেটিসিকোএড কিন্তু এতখানি গ্রাম্য গ্রাম নয় ; কিছু বড় হোটেল, প্রশস্ত পাকা রাস্তা, টেলিফোন ইত্যাদি দেখা গেল। পার্বত্য পরিবেশ এবং বহু জলধারাই এখানকার প্রধান সম্পদ। ছোট ছোট জলধারাকে এরা শুধু যে ঝর্ণা (falls) আখ্যা

দিয়েছে তাই নয়, নানারকম নামও দিয়েছে তাদের। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সোআলো ফল্স (Swallow Falls)। প্রচণ্ড বৃষ্টি তুচ্ছ করে এই ঝর্ণা দেখতে গিয়ে তার আশ্চর্য ক্ষুদ্রতায় বিরক্তির মধ্যেও হাসি পেল।

বৃষ্টি যে আরম্ভ হয়েছে আর থামবার নাম নেই। কখনো টিপটিপ ক্লান্ত সুর তার, কখনো প্রচণ্ড হাওয়ার বেগের সঙ্গে এমন প্রবল ধারায় নেমে আসছে যে আমাদের আষাঢ় মাসকেও হার মানায়। জামা কাপড় তো ভিজেছেই, জুতোর মধ্যে জল ঢুকে অস্বস্তি বাড়িয়েছে সবচেয়ে বেশী। এই অবস্থায় আরেক গ্রামে এসে পৌঁছালাম দিনের শেষে।

নাম খ্লাংগোলেন (Llangollen)—আবার সেই ডী নদীর পারে। সৌভাগ্যক্রমে প্রথম চেষ্টাতেই আশ্রয় জুটল। নির্জন পথে বহু পুরনো এক গৃহের সামনে বিজ্ঞাপন দেখে কড়া নাড়লাম। অনেকক্ষণ কোনো সাড়াশব্দ নেই, তারপর জীর্ণ দরজা খুলে ঘনায়মান অন্ধকারে তেলের বাতি হাতে দেখা দিলেন এক বৃদ্ধা, ডেকে নিয়ে গেলেন ভিতরে। নিচতলায় রান্নার ও খাবার একটি ঘর, সেখানে আছে গ্যাসের আলো, কিন্তু উপরে সম্পূর্ণ অন্ধকার, যেন ঠিক আমাদের পাড়াগাঁর বাড়ি। মোমবাতি জ্বেলে সংকীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে পথ দেখিয়ে গৃহকর্ত্রী নিয়ে এলেন সেখানে। দুটি মাত্র ঘর,—একটি খুব

ছোট, তাতে উনি থাকেন, আর অপেক্ষাকৃত বড়টি ভাড়া দেন আমাদের মত অতিথিদের। সে ঘরে শোবার জন্য একটি মোটে প্রশস্ত খাট। আসবাবপত্রে যেন তিন শতাব্দীর গন্ধ; বইয়ে পড়া কত চিত্র ভেসে উঠে মনে স্বপ্নের মত। বাড়ির ভিতরেই তোলা জলে হাতমুখ ধোবার ব্যবস্থা, কিন্তু বাইরে বেশ খানিকটা হেঁটে গিয়ে বারোয়ারী কল ও পায়খানা। এ যেন ঠিক সেই আদ্যিকালের গ্রাম—যা বর্তমান ইংলণ্ডে একেবারেই অসম্ভব।

আমাদের এই বৃদ্ধাও সেই আদ্যিকালের ঠাকুমা। কানে ভাল শোনেন না, কিন্তু মুখে হাসিটি লেগেই আছে; চলতে ফিরতে কষ্ট হয়, কিন্তু অসমর্থ দেহ নিয়েও আমাদের সুখসুবিধার জন্য ব্যস্ত। সৌভাগ্যক্রমে এসে পড়ল তার মেয়ে। কাছেই থাকে সে নিজের পরিবারের সঙ্গে, দিনের মধ্যে মাঝে মাঝে এসে মার কাজকর্ম করে দিয়ে যায়। চটপট আমাদের জুতো-জামা শুখাবার ব্যবস্থা করে আহার পরিবেশন করলে সে। গরিবের খানা: মোটা রুটি, টিনের ঠাণ্ডা মাংস, চা। তারপর আগুনের সামনে বসে অনেকক্ষণ নানারকম গল্পসল্প হল। সহজ, ঘরোয়া, অনাড়ষ্ট আলাপ—এত স্বল্প পরিচয়ে যা পাশ্চাত্য দেশে অত্যন্ত বিরল। যখন বললাম ছেলেবেলাকার দেশের বাড়ির রোমাঞ্চ টের পাচ্ছি তার কুটিরে এসে, বৃদ্ধা অনাবিল আনন্দে

হাসলেন। আগুনের তাপে জুতো-জামার জল চোখের সামনে বাষ্পীভূত হয়ে উবে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে গত দুদিনের বৃষ্টিসিক্ত বিরক্ত মনও আমাদের তাজা হয়ে উঠল—যা দুঘণ্টা আগেও আশা করতে সাহস হয়নি।

··· বিছানায় বসে মোমের আলোয় ডায়ারি লিখছি। সঙ্গীরা নিদ্রামগ্ন। বাইরে অবিশ্রাম বৃষ্টি। অনেক দূর থেকে ট্রেন ছাড়ার একটা শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। কাল ঐ স্টেশন থেকেই পাড়ি দেব আবার সুসভ্য ইংলণ্ডে, আলো-কোলাহলপূর্ণ লণ্ডনে। ··· আর কোথাও কোনো সাড়া নেই। না না—কান পেতে শুনলে বৃষ্টির ঝমঝমানির মধ্যে শোনা যায় ডী নদীর কলস্বর। এই ডী নদী পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল ওএল্‌সের অন্তর্দেশে, কাল বিদায়ের মুহূর্তেও সে থাকবে কাছে। সেদিনের সেই রৌদ্রোজ্জ্বল অলস প্রভাতে সে মুগ্ধ করেছিল, আজ বর্ষাক্লান্ত সায়ান্ধকারে তার যে রূপ দেখেছি তাও ভুলবার নয়। পরের দিনে যখনই মনে পড়বে ওএল্‌স দেশের কথা, মনে পড়বে তার অবিনশ্বর আত্মার মূর্তি তার প্রতিভার ধাত্রী এই নদীকে।

আরো চেপে এল বৃষ্টি। আলো নিভিয়ে ঢুকলাম লেপের গহ্বরে, আরেক স্বপ্নরাজ্যে।

দ্বিতীয় খণ্ড

আমেরিকা

য়োরোপেরই উপাদানে তৈরি বর্তমান আমেরিকা, এই নতুন জাতির বয়স দুশো বছরেরও কম, কিন্তু এরই মধ্যে নিজস্ব বিশেষত্বের ছাপ তার সর্বাঙ্গে। তা দেখা যায় ওদের ভাষায়, পোশাকে, কিছুটা ছোটখাটো রীতিনীতিতে এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে। এমনকি এ কথা বললে বোধহয় ভুল হয় না যে বিদেশী পর্যটকের চোখে য়োরোপের তুলনায় আমেরিকার নতুনত্ব এশিয়ার তুলনায় য়োরোপের নতুনত্বের কম নয়।

বিগত মহাযুদ্ধের ফলে জগতের অধিকাংশ লোকের পক্ষে জীবনযাত্রা আজ অল্পবিস্তর কঠিনতর। কিন্তু উত্তর আমেরিকার জাতীয় সমৃদ্ধি বেড়েই চলেছে। যুদ্ধের আগে পাশ্চাত্য জগতের নেতা ছিল ইংলণ্ড, আজ তার আর্থিক মেরুদণ্ড গেছে ভেঙে এবং আমেরিকা প্রতিষ্ঠিত সেই আসনে। যে আমেরিকাকে আগে আন্তর্জাতিক কাজকলাপের মধ্যে সহজে আনা যেত না আজ জাতি-সম্মেলনে তারই প্রভাব সবচেয়ে বেশী। তাছাড়া আছে উত্তর আমেরিকার ভৌগোলিক বিশালতা—এক রাত্রি ট্রেনে

কাটালেই নতুন দেশে আসা যায় না সেখানে। এই সব কারণেও ১৯৫২ সালের আমেরিকা দেখা য়োরোপ ভ্রমণের পুনরাবৃত্তি নয় মোটেই।

নবাগতের চোখে আমেরিকার প্রাথমিক ছবিটা কল্পনা করা যাক। জাহাজ থেকে নেমে সে ঢুকল সংলগ্ন রেস্তরাঁতে। চার আনা দিয়ে একখানা খবরের কাগজ কিনে বসেছে, পরিবেশিকা এসে রেখে গেল কাগজের গ্লাসে তুষার-শীতল জল, কাগজের রুমাল আর খাদ্যতালিকা। ওর অঙ্গসৌরভ, ফ্যাশান-দুরস্ত পোশাক, নাইলনের মোজা ইত্যাদির থেকে চোখ সরিয়ে খাদ্য-তালিকায় মনোযোগ দিয়ে প্রথমেই চোখে পড়ল নানা রকম ফলের রস। প্রধান ভোজ্যের মধ্যে বিবিধ সামুদ্রিক প্রাণীর বিশিষ্ট স্থান, কিন্তু সনাতন য়োরোপীয় খাদ্যও আছে। পরি-বেশিকা ফিরে এলে তারই থেকে কিছু বেছে দিয়ে আগন্তুক খবর-কাগজের পাতা উল্টে গেল। বিশেষ করে চোখে পড়ল রংবেরঙের comic strips, পাতার পর পাতায় কত নায়ক নায়িকার রোমাঞ্চকর বা হাস্যকর অভিজ্ঞতার কাহিনী ছবি দিয়ে একটু একটু করে রোজ বলা। খবর-কাগজের ওজনও অবাক করল, এতগুলি পাতা যুদ্ধের আগেও কোথাও দেখেছে বলে মনে পড়ে না।

খেতে খেতে পারিপার্শ্বিক নতুনত্বগুলি সকৌতূহলে লক্ষ

করলে সে। এক দিকে অর্ধবৃত্তাকার টেবিল ঘিরে উঁচু টুল মেঝের সঙ্গে গাঁথা, তাতে বসে কেউ খাচ্ছে কফি, কেউ বা প্রকাণ্ড রঙিন আইসক্রীম, কেউ কোকা কোলা বা ঐ জাতীয় কোনো 'মৃদু পানীয়'। টেবিলের ওপারে কফির ভাণ্ড, রুটির ফালি ইত্যাদি বৈদ্যুতিক চুলায় চাপানোই আছে, তাছাড়া নানা-বিধ চকচকে ক্রোমিয়াম-মণ্ডিত যন্ত্র—কারো থেকে বার হয় ফলের রস, কেউ দেয় আইসক্রীমের ঝরনা। এক ব্যক্তি এক গ্লাস বরফ দেওয়া চা নিয়ে খবর-কাগজের কমিক পাতা খুলে ধরল।

খাওয়া শেষ করে দামের দিকে চেয়ে একটু চমক লাগল। এক পাত্র কফির দামই আট আনা! বাইরে এসে জুতো পালিশ করাতে দিতে হল পাঁচ সিকে এবং তার সঙ্গে আট আনা বকশিশ। ঘরের খোঁজে হোটেলে টেলিফোন করতে গেল আট আনা।

ট্যাক্সি চড়ে হোটেলের দিকে যেতে নিউ ইয়র্কের রাস্তায় অনেক জাতের লোক চোখে পড়ল। পোশাকেরও কত রকম বৈচিত্র্য, অথচ কেউ কারো দিকে চেয়েও দেখছে না। আর এ দেশে এত নিগ্রো ছিল কে জানত!

হোটেলে পৌঁছে চৌদ্দ তলায় তার ঘরে (ভাড়া দৈনিক পঁচিশ টাকা—খাওয়া বাদে) যখন সে ঢুকল তখন এই এক ঘণ্টার নতুন অভিজ্ঞতায় সে অল্পবিস্তর মুহ্যমান।

উত্তর আমেরিকায় দেশ দেখার প্রধান রোমাঞ্চ ওদের অভিনব রীতিনীতি, জীবনযাত্রার ধারা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মধ্যে; য়োরোপ এশিয়ার মত এখানে ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় নেই পদে পদে। দেখবার যা আছে তা প্রায় আনকোরা নতুন—তাদের বিশেষত্ব বয়সের মর্যাদায় নয়, বরং নতুন যৌবনের গর্বে। নতুন দেশ গড়ে তোলার সুবিধা এই যে অন্যের দেখে শেখা যায়, ভুল শোধরানো যায়; এদের শহরের নক্‌শায় সেই শিক্ষা চোখে পড়ে। নেই য়োরোপের মত আঁকবাঁকা বা ঢালু পাথর বসানো সরু রাস্তা (যার অবশ্য আছে নিজস্ব মোহ), এখানে সোজা সোজা জ্যামিতিক রাজপথ, সংখ্যা বা বর্ণমালা দিয়ে তাদের নামকরণ, যথা 'এ স্ট্রীট' বা '১ম অ্যাভিনিউ'। উত্তর-দক্ষিণে যদি হয় অ্যাভিনিউ তবে পুব-পশ্চিমে হয়তো স্ট্রীট; একদিকে যদি হয় ১, ২, ৩ তবে তার আড়াআড়ি এ, বি, সি। রাস্তাগুলি সমান্তরাল হওয়াতে দুই মোড়ের মধ্যে বাড়ির সংখ্যা মোটামুটি একই (ওরা এইটুকুকে বলে এক ব্লক)। সুতরাং বেশী খোঁজা-খুঁজি না করে যে কোনো ঠিকানার হদিস মেলে। যথা, যদি চাও ১০০নং ৭ম অ্যাভিনিউ এবং যদি এক এক ব্লকে দশটি করে বাড়ি থাকে, তবে ৭ম অ্যাভিনিউর বাসে অথবা সুরঙ্গ ট্রেনে চড়ে ১০ম স্ট্রীট স্টেশনে নামতে হবে। দুনিয়ায় সেরা পরিকল্পিত

শহর বোধহয় ওআশিংটন, আড়াআড়ি রাস্তার মধ্যে এখানে আবার কোনাকুনি প্রশস্ত রাজপথ থাকাতে চলাফেরার সুবিধা আরো বেড়েছে। এ শহর ব্যাবসার ক্ষেত্র নয়, এখানে সবাই ব্যস্ত সরকারী কাজে। বিবিধ স্থাপত্যধারায় তৈরি সরকারী দপ্তর-খানাগুলি দেখবার মত। পুণ্যাত্মা আমেরিকানদের স্মৃতিমন্দির, কংগ্রেস, প্রেসিডেন্ট-ভবন ইত্যাদির পারস্পরিক অবস্থিতি ও দূরত্বে সযত্ন পরিকল্পনা সহজেই চোখে পড়ে।

লিংকন মেমরিয়াল অনেকটা গ্রীক মন্দিরের মত দেখতে, সামনে সুদীর্ঘ দীঘির জলে দূর থেকে তার প্রতিবিম্ব অতি মনোরম দেখায়। প্রশস্ত সোপানে অনেকখানি উঠেই এব্রাহাম লিংকনের মূর্তি, প্রস্তরফলকে খচিত তার প্রসিদ্ধ বাণী। সিঁড়ির উপর দাঁড়ালে উল্টো দিকে দূরে চোখে পড়ে ক্যাপিটল বা কংগ্রেসগৃহ, মাঝপথে এক সুউচ্চ স্তম্ভ, উপরটা তার পেনসিলের মত কাটা—ওআশিংটন মনুমেণ্ট। ছুটির দিনে সারি বেঁধে লোক দাঁড়ায় লিফ্‌ট দিয়ে উপরে উঠবার জন্য, সেখানে উঠে চার পাশের চারটি জানলা দিয়ে সমস্ত শহর দেখা যায় ছবির মত। জেফার্সন স্মৃতিমন্দিরের স্থাপত্য আবার অন্য রকম, গম্বুজের মত ছাত। কংগ্রেস-গৃহে গাইড আছে ঘুরিয়ে দেখাবার জন্য, কিছুক্ষণ বসে সদস্যদের বক্তৃতাও শোনা যায়। এর সংলগ্ন পুস্তকালয় জগতবিখ্যাত, পুঁথির সংখ্যা আর গবেষণার সুবিধার জন্য।

ভিতরে পাঠকের সুখসুবিধার এমন সুন্দর ব্যবস্থা আর কোথাও দেখিনি।

প্রেসিডেণ্ট-গৃহ বা হোআইট হাউসের দরজা সপ্তাহে এক-দিন খোলা হয় কিছুক্ষণ সাধারণের জন্য। সারি বেঁধে লোক ঢোকে, কয়েকটা ঘরের মধ্য দিয়ে হেঁটে অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। ঘরের নাম নীল কক্ষ, লাল কক্ষ ইত্যাদি, এক একটায় এক এক রঙের প্রাধান্য আসবাবে সজ্জায়। দিনের কাজ বা প্রহর অনুসারে তাদের ব্যবহার। আড়ম্বর বা জাঁকজমক বিশেষ কিছু চোখে পড়ল না, শুধু এক খাবার ঘরের প্রকাণ্ড টেবিলটা ছাড়া।

এ শহরে দেখবার জিনিসের মধ্যে সব চেয়ে ভাল লেগেছে ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি। বহির্দৃশ্যের মতই মনোরম এ গৃহের ভিতরের ব্যবস্থা। তাই, যদিও এই প্রদর্শনী য়োরোপীয় কলা-ভবনের তুলনায় ঐশ্বর্যে খাটো তবু সহজে সে দাগ রাখে মনে। দর্শকের সুখসুবিধার প্রতি এতখানি নজর য়োরোপে কোথাও দেখিনি। যারা এই ধরণের প্রদর্শনী সমনোযোগে দেখতে অভ্যস্ত তারা জানেন কাজটা শরীরের পক্ষে কতখানি ক্লান্তিকর। এ গৃহের হাওয়া নিয়মন ব্যবস্থা (air conditioning) শুধু যে দর্শকের শ্রম হরণ করে তাই না, ছবিগুলিও রাখে ভাল। ঘরে ঘরে প্রশস্ত সুকোমল আসন—বিশেষত বড় বা প্রসিদ্ধ ছবির সামনে। উপর থেকে সূর্যালোক ঢুকবার এমন ব্যবস্থা

যাতে ছবির গুণ বিকশিত হয় পূর্ণ মাত্রায়। কিন্তু সবচেয়ে ভাল লাগে যে ছবির সঙ্গে তার নাম আর শিল্পীর নাম স্পষ্টাক্ষরে লেখা। এতে পয়সা দিয়ে তালিকা কিনতে হয় না কিন্তু আরো বড় সুবিধা এই যে বই খুঁজে খুঁজে ছবির তথ্য উদ্ধার করার অনাবশ্যক ক্লান্তি এড়ানো যায়। তালিকা বিক্রির বাড়তি আয়টুকু হয়তো এদের না হলেও চলে কিন্তু এ ব্যবস্থার আরেকটা কারণ আমার মনে হয় এই যে এরা পুরাতনের সংস্কার থেকে অনেক বেশী মুক্ত য়োরোপের তুলনায়, যা কিছু শ্রম লাঘব করে তাই সহজে গ্রহণ করে এই নতুন দেশ। প্রদর্শনী যে দেখতে আসে সাধারণত তার আরেক সমস্যা কোথায় আরম্ভ করবে এবং কোন পথে চলবে। এখানে এক একটা যুগধারা অনুসারে ঘরগুলি সাজানো এবং চলার নিয়ম বাঁধা। বিনামূল্যে প্রাপ্য এক পুস্তিকা আরো সাহায্য করে বিশ্বশিল্পের ক্রমপরিণতি বুঝতে। বিখ্যাত গুলবেংকিয়ান সম্পত্তির অনেক বহুমূল্য ছবি এই গৃহে রক্ষিত। বিশেষ করে চোখে পড়ে ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পী এডুআর মানে অঙ্কিত প্রসিদ্ধ ছবি Boy blowing Bubbles এবং Boy with Cherries।

এই প্রসঙ্গে এই শহরের Smithsonian Institution এবং Corcoran Galleryর প্রদর্শনীর নামও করা যেতে পারে। প্রথমটি ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়ে

বিখ্যাত, দ্বিতীয় গৃহে চিত্রে ভাস্কর্যে আধুনিক মার্কিন ধারার অনেক নিদর্শন দেখা যায়।

জুলাই মাসের চার তারিখ আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার দিন। বিশেষ করে রাজধানীতে সেদিন নানা রকম উৎসব হয়, তার মধ্যে সন্ধ্যার পরে আলোর খেলা নাকি খুবই সুন্দর, রঙের ফোয়ারায় আকাশ ভরে যায়। ঘটনাচক্রে ওআশিংটনে ছিলাম সেদিন, সন্ধ্যার আগে ওআশিংটন মনুমেণ্টের নিচে পৌঁছে দেখি তারই মধ্যে ভীড় বেশ জমেছে; কম্বল, চাদর, খবর-কাগজ বিছিয়ে মাঠে বসে গেছে আবালবৃদ্ধবনিতা—অনেকে খাবার নিয়ে এসেছে বাড়ির থেকে। বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ একটি লোক আমার সঙ্গে আলাপ করলে, তার প্রথম প্রশ্ন আমি কলকাতার লোক কিনা। কোএকার সম্প্রদায়ের কর্মী সে, যুদ্ধের আগে চীনে অনেক দিন ছিল, তারপর যুদ্ধের সময় কিছুদিন বাংলাদেশে—মেদিনীপুরের বন্যায় সাহায্যের জন্য। দুজনে আকাশের দিকে চেয়ে বসে আছি এমন সময় জানা গেল বৃষ্টির আশঙ্কায় বাজির খেলা একদিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে পরদিন সকালে আমাকে শহর ছাড়তে হল।

আমেরিকার হৃদ্‌যন্ত্র অবশ্য নিউ ইয়র্ক, যদিও দেশের প্রায় বাইরে দ্বীপের উপর তার স্থান। ম্যানহাটান, ব্রংক্‌স, লং আইল্যাণ্ড, কুইন্‌স, ব্রুকলিন এই সব এলাকায় ভাগ করা

এ বিশাল শহর। বোধহয় পৃথিবীর বৃহত্তম নগরী, সব রকম জাতির লোকের বাস এখানে, মানুষের কার্যকলাপেও বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। দক্ষিণ-পশ্চিমে ম্যানহাটান অঞ্চলই শহরের প্রধান অঙ্গ ও কর্মক্ষেত্র। উত্তরে সম্ভ্রান্ত কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সরস্বতীর আসন, একেবারে দক্ষিণে ওআল স্ট্রীটে লক্ষ্মীর রাজত্ব। মাঝখানে ব্রড্‌ওএ ও ফিফ্‌থ অ্যাভিনিউর রঙ্গালয় আর বিপণি-শ্রেণী জগতবিখ্যাত।

শহরের মধ্যে আরেকটি ক্ষুদ্র শহর যেন রকেফেলার সম্পত্তি, এর বিশাল আকাশস্পর্শী অট্টালিকাশ্রেণীর মধ্যে না পাওয়া যায় এমন জিনিস নেই। সবচেয়ে চমকপ্রদ এর রেডিও সিটি মিউজিক হল—বোধহয় পৃথিবীর বৃহত্তম রঙ্গালয়। ভিতরে এক দিক থেকে আরেক দিক প্রায় ধু ধু করে, মঞ্চের উপর এত লোক একত্র ধরে যে গুণে ওঠা যায় না। এখানে চলচ্চিত্রের সঙ্গে মঞ্চের বিবিধ অনুষ্ঠানও থাকে—নাচ, গান, হাসির নক্‌শা, সার্কাসের খেলা, ম্যাজিক। উত্তর আমেরিকায় সিনেমা টিকিটের দাম অবশ্য ঘর ভেদে এবং প্রহর ভেদে বদলায়, কিন্তু যে কোনো এক গৃহে সাধারণত অগ্রপশ্চাতে একই দাম ; এ ঘরে কিন্তু তা নয় এবং সকালের দিকেও নিম্নতম প্রবেশমূল্য প্রায় ছ টাকা, যত বেলা পড়ে তত আরো বাড়তে থাকে।

‘সব চেয়ে বড়’র এই দেশে আরেকটির উল্লেখ এখানেই করা

উচিত—আকাশচুম্বী এম্পায়ার স্টেট অট্টালিকা। ১০২ তলার এই বাড়ি ১৪৭২ ফুট উঁচু, লিফ্‌ট দিয়ে ছাতে উঠবার জন্য দিতে হয় দু ডলারের মত, সেখানে টের পাওয়া যায় যে বাতাসের তাপ কম। নিচের দৃশ্য অনেকটা এরোপ্লেন থেকে দেখার মত,—রাস্তাগুলি যে কতখানি সরল ও সমান্তরাল তা স্পষ্ট দেখা যায়, লোকজন পিঁপড়ের চেয়েও ছোট, গাড়িগুলি যেন চলছে খুব ধীরে। ম্যানহাটানের দুই দিকে হাডসন ও ঈস্ট্ নদী পরিষ্কার দেখা যায়, বাঁ পাশে বন্দরে অতলান্তিকের বিশাল জাহাজ সব পাশাপাশি সাজানো, ডান তীরে জাতিসংঘের নতুন প্রাসাদই সর্বাগ্রে চোখে পড়ে, তারপর ব্রুকলিন এবং তাকে জুড়ে অনেক সেতু।

জাতিসংঘের সাধারণ সভার (General Assembly) গৃহ তখনো সম্পূর্ণ হয়নি, কিন্তু প্রধান দপ্তরখানায় ঢোকা গেল। কাঁচে মোড়া দেশলাই বাক্সের মত এই প্রাসাদে প্রায় চল্লিশ তলা জুড়ে জাতিসংঘের আপিশ ছাড়াও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের নিজস্ব ঘর আছে। যার যেমন দরকার ঘরে ঘরে বাতাসের তাপ সেই রকম নিয়ন্ত্রিত। বিশেষ মণ্ডলীগুলির অধিবেশনের জন্য কয়েকটি সভাঘর আছে, নরোএ এবং য়োরোপের অন্যান্য কয়েকটি দেশ তার এক একটি সাজিয়েছে নিজ নিজ জাতীয় ছন্দে। প্রকাণ্ড কাঁচের জানলার বাইরে নদী বয়ে যাচ্ছে,

ভিতরে সভাপতির দুপাশে অর্ধবৃত্তাকারে বসেন সদস্যরা, তাদের মুখোমুখি প্রথমে সাংবাদিকদের তার পরে সাধারণ দর্শকের আসন ধাপে ধাপে উঠে গেছে। ছোট ছোট খুপরির মধ্যে সুদক্ষ ভাষাবিদরা বক্তৃতা অনুবাদ করে চলেছে বক্তার মুখ দিয়ে কথা বার হতে না হতে। প্রত্যেক চেয়ারের সঙ্গে সংলগ্ন যন্ত্র কানে লাগিয়ে এবং ইচ্ছামত বোতাম ঘুরিয়ে ইংরেজী, ফরাসী, স্পেনীয়, রুশ বা চৈনিক ভাষায় একই বক্তৃতা শোনা যায়।

নিউ ইয়র্কের আশেপাশে অনেক ক্ষুদ্র দ্বীপ, তারই একটাতে অধিষ্ঠিতা প্রসিদ্ধ লিবার্টি প্রতিমূর্তি, অতলান্তিকের জাহাজকে হাত তুলে ইনিই প্রথম সম্ভাষণ করেন। শহর থেকে খেয়াতরীতে করে ওর কাছাকাছি গিয়ে দেখলে ভদ্রমহিলার চেহারার লালিত্য যেন কমে যায় অনেকখানি। ধাতুর তৈরি এই বিশাল মূর্তি ফ্রান্স উপহার দিয়েছে আমেরিকাকে। ভিতরে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে পা ব্যথা হয়ে যায়, পুরস্কার স্বরূপ মাথার কাছে জানলা দিয়ে দেখা যায় বাইরের দৃশ্য, কিন্তু দাঁড়াবার জায়গা নেই, সুতরাং পিছনের লোকের ঠেলায় নেমে আসতে হয় সঙ্গে সঙ্গে।

ছুটির দিনে দক্ষিণে কোনি আইল্যাণ্ডেও সমুদ্রলোভীদের ভীড়। গ্রীষ্মকাল হলে তো লোকে লোকারণ্য। সকলে অবশ্য জলে নামে না, এমনকি বালিও ছোঁয় না, কারণ জায়গাটা

আসলে প্রকাণ্ড এক প্রমোদ-মেলা—বোধহয় তুনিয়ার 'সব চেয়ে বড়'! গড়িয়ে নামার লৌহপথ আকাশ ছেয়ে ফেলেছে অতিকায় জন্তুর কঙ্কালের মত, এবং এই ধরণের শারীরিক রোমাঞ্চ ছাড়া বিবিধ জুয়ার খেলা, সার্কাস ইত্যাদি তো আছেই।

নিউ ইয়র্কের নাড়ি টাইম্‌স স্কোয়ার, তার আসল চেহারাটা দেখা যায় সন্ধ্যার পরে। লোকের ভীড় ও চাঞ্চল্য, বিজ্ঞাপনের কর্কশ রঙিন আলো এসব মিলে চোখ ঝলসে দেয়, কিছুক্ষণ পরে যেন মাথা ঘুরতে থাকে। আশেপাশে যে অসংখ্য সিনেমা থিয়েটার তারই কোনো একটার মধ্যে ঢুকে পড়লে তবে যেন একটু শান্তি।

কিন্তু চোখ ধাঁধানো দ্রষ্টব্যের বাইরেও নিউ ইয়র্কের আরেকটা দিক আছে উপভোগ করার মত। সবচেয়ে আগে মনে পড়ছে এদের যাতুঘরের হাইডেন প্ল্যানেটেরিয়াম। এখানে সাধারণের জন্য রোজ অত্যন্ত উপভোগ্য বক্তৃতা থাকে জ্যোতির্লোকের এক একটা বিষয় সম্বন্ধে। দলে দলে লোক আসে দেখতে আর শুনতে। প্রথমে এক ঘরে অশরীরী এক স্বর ঘূর্ণমান মডেলের সাহায্যে সৌরজগৎ তারা নীহারিকা সম্বন্ধে আকাশের এক সম্যক পরিচয় দেয়, তারপর উপরের তলায় ঘর অন্ধকার করে আরম্ভ হয় আসল অনুষ্ঠান। একটি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে আকাশকে এনে ফেলা হয় ঘরের ছাতে, একই যন্ত্র এত নিপুণ ও

সুন্দর ভাবে জ্যোতির্লোকের বহু বিভিন্ন ঘটনা প্রতিফলিত করে যে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। চন্দ্রসূর্যের উদয়াস্ত, তারার চলাফেরা এসব তো আছেই,—একবার দর্শকদের যখন চাঁদের দেশে নিয়ে যাওয়া হল, রকেটের গবাক্ষে দেখা গেল পৃথিবী আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে, অন্যদিকে চাঁদ আসছে এগিয়ে; রকেট যখন নামল চাঁদে দিগন্ত পর্যন্ত সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

পাশেই যাত্নঘরের প্রধান বাড়িটা দেখে শেষ করতে দিন কেটে যায়। বিশেষ করে নজরে পড়ল প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু ডাইনোসরাসের কঙ্কাল।

চিত্র ও ভাস্কর্যের হুটি গৃহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য—মেট্রো-পলিটান মিউজিয়াম এবং আধুনিক ধারার জন্য মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট।

আর একটি জায়গা খুব ভাল লাগল, যদিও সেখানে দর্শকের ভীড় নেই। ম্যানহাটানের উত্তরে ফোর্ডহাম পল্লীতে এডগার অ্যালান পো-র কুটির। তখনকার দিনে বাড়িটা ছিল কিছু দূরে, পরে এখানে এনে তার সংস্কার করা হয়। সবুজ একটুখানি জমির মধ্যে গাছের ছায়ায় সাদা এক কাঠের বাড়ি, এখানে ১৮৪৬ সালে পো আসে বাস করতে স্ত্রী আর স্ত্রীর মাকে নিয়ে। সরু একফালি বারান্দার পরে বাড়ির প্রধান ঘর, সেখানে তার

রকিং চেয়ার রয়েছে এখনো। পাশে ছোট্ট শোবার ঘরের প্রায় সবটা জুড়ে কাঠের খাট ; এই শয্যায় স্ত্রী ভার্জিনিয়া মারা যায় এক বছর যেতে না যেতে। উপরের তলায় ঢালু ছাতের নিচে দুটি ছোট খুপরি। এই গৃহে পো পেতেছিল তার অতি দরিদ্র কিন্তু পরিচ্ছন্ন সুচারু সংসার, এইখানে শেষ হয়েছে তার বিষণ্ণ আশ্চর্য জীবন। নিজের অনেক শ্রেষ্ঠ গল্প কবিতা ঐ তিন বছরের মধ্যে লিখেছিল সে।

মিউজিয়াম প্রসঙ্গে আর দুটি ঘরের কথা মনে পড়ছে বিশেষ করে। ফিলাডেলফিয়া শহরের নিরিবিলি অংশে গাছের ছায়ায় এক ছোট বাড়িতে আছে বিখ্যাত ভাস্কর রোডাঁ (Rodin) নির্মিত বহু মূর্তি। মিউজিয়াম দেখা এই রকম নির্জনেই হওয়া উচিত, শহরের গোলমালের মধ্যে বা অনেক দর্শকের ভীড়ে যাদের সঙ্গে পরিচয় করতে আসি অতীতের আড়াল থেকে তাদের কথা ভাল শোনা যায় না। এই মূর্তিগুলির অধিকাংশই অবশ্য নকল, কিন্তু ঐ শিল্পীর কারুকাজ একসঙ্গে এতগুলি আর কোথাও দেখিনি।

বস্টন শহরে নদীর ওপারে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক যাদুঘরে কাঁচের কাজের অত্যন্ত আশ্চর্য এক প্রদর্শনী আছে। গাছপালা ফলফুল কীটপতঙ্গের এমন সুন্দর অনুকরণ যে ভাল করে পরীক্ষা করেও ধরা যায় না যে তা প্রকৃতির সৃষ্টি নয়।

শুনেছি এই দক্ষতা আয়ত্ত করেছিল শহরের একটিমাত্র পরিবার, এখন কেউ নেই আর বেঁচে।

বস্টন শহর আমেরিকার উত্তর-পুবে নিউ ইংলণ্ড অঞ্চলের প্রধান ঘাঁটি। এইখানে এই দেশের গোড়াপত্তনের যুগে ইংরেজদের আদি উপনিবেশ, সেই কারণে এখানে ইংরেজী ছাপ এখনো কিছু আছে এদের ঘরবাড়িতে এবং আদবকায়দায়; সম্ভ্রমের ভেদবিচারে এবং নিয়মনিষ্ঠায় এরা রক্ষণশীল। জল-বায়ুতে অবশ্য ইংলণ্ডের সঙ্গে মিল কিছু দেখা গেল না, জুনমাসের দুপুরে তখন ১০৫ ডিগ্রি পর্যন্ত গরম পড়ল। শীতের দিনেও অবশ্য ঠাণ্ডা ও বরফপাত অনেক বেশী। ইংলণ্ড ও য়োরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় শীতগ্রীষ্মের এই প্রখরতা মোটামুটি উত্তর-আমেরিকার সর্বত্রই বিদ্যমান, এক বোধহয় পশ্চিম উপকূলের কোনো কোনো জায়গা ছাড়া।

একদিন বিকেলে ঘুরতে ঘুরতে এই শহরের বিখ্যাত লাই-ব্রেরির কাছে এসেছি, কিছুটা বিশ্রামের আশায় কিছুটা কৌতূ-হলে ভিতরে ঢুকেছি এমন সময় কানের কাছে কে বলল 'সেলাম আলেকুম'। ফিরে তাকিয়ে যার সহাস্য মুখ চোখে পড়ল নিজের পরিচয়ে সে তার নাম বললে 'চাক'—ভাল নামটা জানানো বোধহয় দরকারই বোধ করলে না। জানা গেল যুবকটি রাজনীতি ও সমাজনীতির খুব উৎসাহী অ্যামেচার পণ্ডিত, যদিও

স্পষ্টই ভুল করেছে আমার দেশটা (এইখানে বলে রাখি আমাকে মুসলমান বলে এ পর্যন্ত আর কেউ ভুল করেনি)। আমাকে সে টেনে নিয়ে গেল এক কোণে ভারত সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে এবং দেশের হয়ে দুকথা বলতে। আমেরিকা সত্যিই নিস্বার্থ হয়ে সাহায্য করতে চায় অথচ আমরা (এবং অন্য সকলেও) কেন সন্দেহ করি তাদের ? বললাম কোনো দেশের সাধারণ লোককে খবর-কাগজ পড়ে জানা যায় না—এটা তাদের দেশে এসেও যেমন আমি উপলব্ধি করেছি তাকেও তেমনি যেতে হবে ভারতে সত্যি করে বুঝতে হলে। চাককে মনে থাকবে অনেকদিন—অন্যান্য দেশে আধঘণ্টা মাত্র আলাপ হয়েছে যাদের সঙ্গে তাদের যখন ভুলে যাব তখনো।

'দেশ দেখা' সারতে সারতে যখন মানুষের সঙ্গে চেনা হয়, রীতিনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে তখন আরম্ভ হয় দেশ জানা। প্রথম দর্শনে যা বিস্ময়, কৌতুক বা বিদ্বেষ উদ্রেক করে ক্রমে তার চেহারা বদলায়, কেন এরা আমাদের মত বা আর কারো মত না হয়ে এইরকম তার উপলব্ধি আসে। একদিকে আচার ব্যবহার দৃশ্যপটে বাইরের বৈচিত্র্য, অন্যদিকে জাতি দেশ নির্বিশেষে মনুষ্যচরিত্রের অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যের সাক্ষাৎ—এর কোনটা যে দেশভ্রমণের অধিকতর বড় রোমাঞ্চ তা বলা কঠিন।

খাবার ও রান্নার প্রসঙ্গে একথা স্বীকার করতে হবে যে ফরাসী বা ইটালীয় খাদ্যের মত স্বাদ এরা সৃষ্টি করতে পারে না, রান্নার ললিতকলা এরাও জানে না। কিন্তু তাবলে ইংলণ্ডের মত দলানো আলু এবং বাঁধাকপি সিদ্ধ এদেশে সবজির রাজা বলে গণ্য নয়। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারও এদের অফুরন্ত, তাতে অন্যদিকের ক্ষতি অনেকখানি পূরণ হয়। তাছাড়া সারা দুনিয়ার লোক এখানে এসে ঘর বেঁধেছে, সুতরাং প্রায় সব দেশের রেস্তরাঁই পাওয়া যায় অন্তত বড় শহরগুলিতে। চীনের লোকেরা পৃথিবীর সর্বত্রই প্রায় ছড়িয়েছে—সঙ্গে এনেছে ধোবার ব্যাবসা আর অপূর্ব পাচকী কৌশল। এদেরও পাড়ায় পাড়ায় চীনে রেস্তরাঁ। চৈনিক পাক সর্বদেশে আদৃত—অনেকের মতে তা মনুষ্যজীবনের সামান্য কয়েকটি প্রকৃত আনন্দের অন্যতম—কিন্তু তার মধ্যেও দেশে দেশে কিছু ভেদাভেদ চোখে পড়ে। এদেশে ওরা প্রথমেই টেবিলে দিয়ে যায় এক কেৎলি সবুজ চা আর ছোট্ট হাতলবিহীন পেয়ালা। জলের বদলে এই দিয়ে অনেকে তৃষ্ণা মেটায় আহারের শেষ পর্যন্ত। কেৎলি খালি হলে সঙ্গে সঙ্গে বদলে দেওয়া হয়। ভারতীয় রেস্তরাঁ নিউ ইয়র্কে গোটা কয়েক আছে—নিগ্রো পল্লীতে নোয়াখালির এক ভদ্রলোক চালাচ্ছেন এক দোকান; নিগ্রো স্ত্রী আর পুত্রকন্যা নিয়ে। ওখানে যাওয়া হত প্রায়ই কারণ মাত্র এক ডলারে মুরগীর ঝোল আর ভাত পাওয়া যেত।

ভদ্রলোক কাছে এসে দাঁড়াতেন, বহুদিনের না-দেখা দেশের কথা শুনবার লোভে।

আমেরিকানদের সর্বব্যাপী নিয়ম-শৈথিল্য আহারের ক্ষেত্রেও চোখে পড়ে। কেউ প্রাতরাশ খাচ্ছে ভারি করে ইংরেজী মতে ডিম বেকন দিয়ে, আবার কেউ কন্টিনেণ্টাল য়োরোপীয়দেরও হার মানিয়ে খালি এক পাত্র কফি গিলে যাচ্ছে কাজে। সদামুক্তদ্বার দোকানে যখন খুশি যে কোনো খাবার মেলে, বিলেতের মত লাঞ্চ টি ডিনারের সময় ভাগ করা নেই। রাত এগারোটায় কেউ যদি কর্নফ্লেক খায়, লোকে তাকিয়ে দেখবে না তার দিকে।

রকমারি ফলের রস—সদ্যনিষ্কাশিত বা টিন-সংরক্ষিত—এদের আহারের বড় অঙ্গ। ভিটামিনের অনেকখানি ওখান থেকে আসে। সকালবেলা প্রথমেই এক গ্লাস কনকনে ঠাণ্ডা রস গেলার সঙ্গে ঘুমের জড়তা সব যেন পালায় মুহূর্তে, রসনা প্রস্তুত হয় আহারের প্রতি। তুষার-শীতল মৃদু পানীয়ের প্রতি এদের টান অবশ্য জগতবিখ্যাত, য়োরোপীয় কন্টিনেণ্টে যেমন মদ মদিরার প্রতি পক্ষপাতিত্ব। (কিন্তু কোকা কোলার আক্রমণে আজ নাকি ফ্রান্স ইটালির সুরাশিল্প মৃতপ্রায়; ওদের কমিউ-নিস্টরা লড়ে চলেছে ডলার সাম্রাজ্যবাদের এই নিদর্শনকে দেশ থেকে তাড়াতে।) অনেক মনিহারী বা ওষুধের দোকানের এক কোণে আছে সোডা ফাউণ্টেন, ওরা যাকে বলে ড্রাগস্টোর

এই সেই প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া সিনেমায় বা রেলস্টেশনে যন্ত্রের বোতাম টিপে পাওয়া যায় নানা রকমের পানীয়, কোথাও কোথাও গরম চা এবং কফি—চিনি দুধ দিয়ে বা না দিয়ে। আপিশ গৃহে, পার্কে এবং সাধারণের আনাগোনার অন্যান্য স্থানে পানীয় জলের ফোয়ারা-যন্ত্র এদের এক পরম উপভোগ্য উদ্ভাবনা। এই ঠাণ্ডা জলে শুধু যে দেহ জুড়ায় তাই না, গ্লাসের ভাবনা নেই, অপরের গ্লাসে মুখ লাগাবার প্রয়োজন নেই। এই কারণেই ভাল লাগে কাগজের গ্লাস, রুমাল, তোয়ালে যা একবার ব্যবহার করেই ফেলে দেওয়া যায়। অনেক স্থানে হাত মোছার জন্য কাগজের তোয়ালেও বাতিল করা হয়েছে; ভিজে হাত এক যন্ত্রের মধ্যে ঢোকালে গরম হাওয়া বইতে শুরু করে এবং জল শুকিয়ে দেয়।

আমেরিকানদের ভাষা ও পোশাকের অভিনবত্বের সঙ্গে আমাদের অনেকেরই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে হলিউডের খাতিরে। টাই বা বুশ-শার্টের উপর ফুলের নক্শা দেখলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ইংলণ্ডে স্কুল-কলেজের ছাত্ররাও টাই ও কোট পরে ক্লাসে যায়, এখানে গেঞ্জি বা টি-শার্ট সম্পূর্ণ রীতিসম্মত।

আমার এক বন্ধু বলতেন টি-শার্ট এবং গাঢ় নীল জীনের পাতলুন আমেরিকার জাতীয় পরিচ্ছদ। এই পোশাক আমাদের গরিব এবং গরম দেশের সমাজেও হয়তো সম্পূর্ণ ভদ্রতাসম্মত

বলে গণ্য হবে না, যদিও এদের রকমারি সূক্ষ্ম হ্রস্ব কামিজ, গলাখোলা শার্ট ইত্যাদি উষ্ণ গ্রীষ্মেরই ফল। জুন জুলাই মাসে এদের দোকান ঘরের দিকে তাকালে বোঝা যায় যে সনাতনের কড়া শাসনকে তুচ্ছ করে এরা বুদ্ধিমানের মত দৈহিক আরামকেই প্রথম স্থান দিয়েছে—অবশ্য তার মধ্যে বৈচিত্র্য আনবার চেষ্টায় রঙের মাত্রা এক এক সময় বেশী উগ্র হয়ে পড়ে।

আমেরিকার শিল্প-নীতি mass production দরজীর ব্যাবসাতেও ঢুকেছে। ব্যক্তিবিশেষের মাপের প্রতি নজর দিতে হলে মজুরি পড়বে অনেক বেশী (মনে রাখতে হবে যে দরজীর মজুরদেরও চাই টেলিভিশন), তাই কয়েকটি বাঁধা মাপ অনুসারে কোট পাতলুন তৈরি হয়ে আসে কারখানা থেকে ; কোটের কবজি আর পাতলুনের গোড়ালির কাছে শেলাই থাকে খোলা, খরিদ্দারের পছন্দ হলে ঐ জায়গাগুলি দরকার মত কেটে শেলাই করে দেয় দোকানদার। একটু আধটু এদিক ওদিক হলে কিছু এসে যায় না, কারণ এদের ফ্যাশান ঢিলেমি বরদাস্ত করে বেশী য়োরোপের তুলনায়। আর যাই হক, বকলস বোতামের পরিবর্তে এদের রীতি অনুসারে বেল্ট ও জিপ দিয়ে পাতলুন পরা অনেক সহজ। এদের শার্টের গঠন আমার মনে হয় জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তা পরতেও সহজ এবং দেখতেও ভাল,—অন্তত কড়া কলারের ফাঁস ও আলাদা কলারের দাসত্ব যে এরা দূর

করেছে এটা যাদের টাই পরতে হয় তাদের পক্ষে এক মস্ত বড় নিষ্কৃতি।

পোশাকের যেমন বাঁধন কম এদের কথার উচ্চারণও আঁট-সাঁট নয় মোটে। শব্দগুলি কখনো বেঁকে বা তুমড়ে গেছে, কেউ যেন তাদের ছুড়ে ছুড়ে ফেলছে এদিকে ওদিকে, কারো সুর শুনলে সন্দেহ হয় কথাগুলি বুঝি নাসিকা-নির্গত। ভাষার প্রতি যাদের দরদ আছে তাদের পক্ষে এক এক সময় রীতিমত পীড়া-দায়ক। এদের কাছে অবশ্য ঐ উচ্চারণই যথার্থ। একদা এক মহিলা কথায় কথায় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা ইংরেজী কথাবার্তা বুঝতে তোমার কি কোনো অসুবিধা হয়?" আমি বললাম, "না, দেশে ইংরেজ রাজত্ব থাকায় ছোট কাল থেকে ওটা আমাকে শিখতে হয়েছিল।" পরম আত্মবিশ্বাসে তিনি বললেন, "তাই, তা না হলে ইংরেজদের কথা সহজে বুঝতে পারতে না— এমন অদ্ভুত উচ্চারণে কথা বলে ওরা!" শুনে এমন চমকে গেলাম যে কিছুই বলতে পারলাম না, মুখে হাসি পর্যন্ত এল না। পরে ইংরেজ বন্ধুদের কাছে গল্পটা বলেছি, সবাই উপভোগ করেছে, কেউ কেউ এমন মন্তব্য করেছে যা এখানে ছাপা চলবে না। যাই হক, বানানকে অনেক জায়গায় সহজ করে এরা কিন্তু ইংরেজী ভাষার উপকার করেছে।

আমেরিকা সম্বন্ধে বিশ্বের দুটি প্রধান কৌতূহলের বিষয়

ওদের জীবনযাত্রার মান (standard of living) ও বর্ণভেদ। দ্বিতীয় প্রসঙ্গের আলোচনা পরে করব, প্রথমটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক জিনিসপত্রের দামের, যার ইঙ্গিত আগে কিছু দিয়েছি। ট্রাম (এদেশে তার নাম street car) বা বাসের ভাড়া আট আনা, কোনো কোনো শহরে বারো আনা। (দূরত্ব অনুসারে ভাড়া বাড়ে না, একই পয়সায় যেখানে খুশি যাওয়া চলে। এই সহজ নিয়মের ফলে গাড়ীতে কণ্ডাক্টার রাখবার দরকার করে না, তাকে মাইনে দিতে হলে ভাড়া নিশ্চয় আরো বেড়ে যেত)। খাবারের দাম কম নয়, অথচ হোটেলে রেস্তরাঁয় এত নষ্ট হয় যে দেখে শুধু আমাদের নয় য়োরোপীয়দেরও মন কাঁদে। এদের যাবতীয় খরচের (cost of living index) মধ্যে টেলি-ভিশনেরও স্থান আছে, নিউ ইয়র্কের দরিদ্র পল্লীতেও বহু কুটিরের ছাতে তার এরিয়াল চোখে পড়ে। আমার জনৈক বন্ধু এক নিগ্রো বাস-চালকের বাড়িতে কিছুদিন ছিলেন, তারও ছিল টেলিভিশন। টেলিফোন ও রেফ্রিজারেটার আছে দরোয়ান বা চাকরানীর ঘরেও। আমেরিকান রান্নাঘরের শ্রমহারী যন্ত্রসমন্বয় বিশ্বের গৃহিণীদের ঈর্ষার বস্তু। বৈদ্যুতিক কাপড়কাচা যন্ত্রও আজকাল অনেক জায়গায় বাড়ি তৈরির সময়ই টেলিফোনের মত বসানো হয়। প্রতি তিন জনের এক জন গাড়ির মালিক এবং এ দেশে ছোট গাড়ি বড় একটা দেখা যায় না। এদেশেই

সম্ভব আকাশের নিচে মেঠো সিনেমা, যেখানে গাড়িতে বসে দেখতে হয় ছবি। যাদের অবস্থা একটু ভাল তাদের অনেকের আছে শহরের অদূরে ছোট কটেজ, শনি রবিবারে বেড়াতে যাবার জন্য। প্রত্যেক বাড়ির নিচে আছে শীতের দিনে ঘর গরমের ব্যবস্থা; ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালবার প্রয়োজন যে হয় না শুধু তাই নয়, বাড়ির সর্বত্র সমান ভাবে এবং ঠিক দরকার মত গরম থাকে। অবশ্য সুইডেন প্রমুখ য়োরোপের কোনো কোনো দেশেও এই ব্যবস্থা আছে ঘরে ঘরে, তাদের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের মানও প্রায় আমেরিকার সমান।

জিনিসের ও চলাফেরার খরচের থেকে বোঝা যায় যে কার-খানার মজুর বা ট্রাম-বাসের ড্রাইভারের জীবনযাত্রার মান অপেক্ষাকৃত উঁচু—অন্যান্য দেশে যা বিলাস তা তার প্রয়োজন। অন্য দেশের লোকের তুলনায় তার হয়তো পয়সা বেশী জমে না, কিন্তু খরচের ফলে আরামের প্রতিদানটা বেশী। এদের রেল-গাড়িতে দুটি শ্রেণী; কোচ বা সাধারণ শ্রেণীও হাওয়া-নিয়ন্ত্রিত, তার ফলে শুধু যে গরমের কষ্ট দূর হয় তাই নয়, চাকার শব্দ কানে লাগে না, ধুলো ঢুকতে পারে না, সিগারেটের ধোঁয়া জমে না। য়োরোপের সাধারণ যাত্রী হয়তো বলবে এত আরামের দরকার নেই, এসব বাদ দিয়ে বরং ভাড়া কমাও। আমেরিকার কোচ-যাত্রী ভাড়া কমাতে চাইবে নিশ্চয়, কিন্তু

সুখসুবিধার বিসর্জনে নয়। এইখানেই প্রকাশ পায় তার জীবনযাত্রার মান।

অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে রেলগাড়ির উপরের শ্রেণীটা তাহলে কী? পুলমান শ্রেণীর আসনে গদি বেশী পুরু, তাদের মধ্যে দূরত্ব বেশী, মেঝেতে ভারি কার্পেট, প্রকাণ্ড বড় কলঘর প্রকাণ্ড আয়না দিয়ে সাজানো, ইত্যাদি তো আছেই, কিন্তু সব চেয়ে বড় সুবিধা যে এই শ্রেণীতে ছাড়া শোবার জায়গা মেলে না। অবশ্য তার জন্য পয়সা লাগে আলাদা। শোবার ব্যবস্থাও রকমারি—প্রথমে ডর্মিটরি, যারা আরো নিরিবিলিতে ঘুমোতে চায় তাদের জন্যে বেডরুম; ছোট্ট একটু কামরার মধ্যে দুটি কোমল উষ্ণ শয্যা এবং প্রয়োজনের সব কিছু উপকরণ—থার্মস্ বোতলে বরফ-জল পর্যন্ত। বোতাম টিপলে সঙ্গে সঙ্গে নিগ্রো কণ্ডাক্টার এসে হাজির। যারা এতেও তুষ্ট নয় তাদের জন্য আছে আরো বড় ঘর এবং সংলগ্ন নিজস্ব ড্রয়িংরুম।

কোচশ্রেণীতে আসনগুলি ট্রাম বাসের মত পাশাপাশি সাজানো, কিন্তু সেগুলিকে এরোপ্লেনের চেয়ারের মত কাত করা যায় অনেকখানি এবং ভাল গদি থাকাতে একেবারে বসে কাটাতে হয় না রাত। ট্রেনের রেস্তরাঁতে খাবারের দাম বড় বেশী, সাধারণ ডিনার প্রায় তিন ডলার, কিন্তু ফিরিওলারা কামরায়

ঘোরাফেরা করে স্যাণ্ডুইচ, হট ডগ (সসেজ ও সর্ষের ঝাল দিয়ে তৈরি বিশিষ্ট আমেরিকান খাদ্য) এবং কাগজের বোতলে দুধ ও ফলের রস ইত্যাদি নিয়ে, সুতরাং কম খরচেও ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তি করা চলে। বরফ-জল অবশ্য বিনা পয়সায় পাওয়া যায় সব গাড়িতে।

এ সব তথ্যের অর্থ এই নয় যে দারিদ্র্য নেই এদেশে। প্রতি বড় শহরেই আছে বিস্তীর্ণ বস্তি। উদ্দেশ্যহীন বেকার লোক পার্কে রাত কাটায়, রেলস্টেশনে বসে ঝিমোয়। ভিক্ষুক যে দেখা যায় না তা নয়; তবে তাদের ভিক্ষার মাত্রাটাও বোধহয় উঁচু। মনে আছে একদিন সকালে নিউ ইয়র্কে ওয়াই-এম-সি-এ রেস্তরাঁতে বসে প্রাতরাশ খাচ্ছি, সামনে সিগারেটের বাক্সটা পড়ে আছে। একটি লোক খেয়ে বেরিয়ে যাবার পথে আমার কাছে দাঁড়াল এবং জিজ্ঞাসা করলে আমি তাকে একটি সিগারেট দিতে পারি কিনা। এই রেস্তরাঁর চেয়ে সস্তা জায়গা অন্যত্র আছে, তথাপি সে এখানে এসেছে খেতে; জীবনধারণের জন্য ধূমপান অপরিহার্য নয়, তবু ভরা পেটে একটি সিগারেট তার না হলে চলে না। এই ভিক্ষুক কখনো যে-সে ভিক্ষুক নয়!

অবাধ উদ্যোগ আর স্বাধীন ব্যাবসার তীর্থক্ষেত্র আমেরিকা, কোনো রকম রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা বা সরকারী নিয়মশাসনের তারা পরিপন্থী। তার ফলে নিতান্ত প্রয়োজনের জিনিসেরও দাম বেশী

এবং সেই কারণে অপেক্ষাকৃত গরিবদের কষ্ট হতে বাধ্য। ওষুধ ও চিকিৎসার খরচ এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ওষুধকে সুদৃশ্য শিশিতে ভরে ছাপার অক্ষরে নাম লিখে ভাল করে কাগজে মুড়তে হয়তো মজুরিই বেশী পড়ে যায় তার আসল দামের চেয়ে। সেই কারণেই এখানে ধোবা যখন শার্ট কেচে তার সর্বাঙ্গে পিন এঁটে পিজবোর্ডের খোলস পরিয়ে সবশুদ্ধ সেলোফেনে ভরে ফেরত দেয় তখন তার জন্য দিতে হয় প্রায় দেড় টাকা।

এত স্বাচ্ছল্য ও আরামের ফলে এদের সুখ শান্তি বেড়েছে কিনা এ প্রশ্ন অনেকের মনে জাগে—এ দেশের লোকের মনেও। একটি ছোট পরিবারের কথা মনে পড়ে,—স্বামী এঞ্জিনিয়ার, স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী এবং তাদের শিশু এই নিয়ে সংসার। কর্তা গৃহিণীর বয়স কম, দেহে যথেষ্ট শক্তি, দুজনেই বেশ খেটে ভাল উপার্জন করে। ছেলেকে দেখাশুনা করবার জন্য একটি ঝি আছে। মা দুঃখ করে বললে ছুটির দিন ছাড়া ছেলের সঙ্গে ভাল করে আলাপই হয় না।

তাহলে চাকরি ছেড়ে দিলেই তো হয়, এত টাকা না হলেও তো চলে!

হ্যাঁ চলে, বেশ আরামেই সংসার চলে বাপের উপার্জনে; কিন্তু এর চেয়ে বড় একটা রেফ্রিজারেটার হলে তাদের ভাল হয়—আর, কিছুদিন আগে নতুন ছাঁদের একটা কাপড়-কাচা যন্ত্র

দেখেছে, চাকরি ছেড়ে দিলে সে সব শিগগির আর হবে না। তাছাড়া বাড়িতে বসে থাকতেও ভাল লাগে না তার। কাজের দিনের কথা ছেড়ে দাও, ছুটির দিন তো সবাই একসঙ্গে কাটায় হৈ হৈ করে, বেড়াতে চলে যায় গাড়ি নিয়ে।

জিনিসের পিছনে এই ছোটার অবশ্য শেষ নেই। পাশের বাড়িতে দশ ইঞ্চির টেলিভিশন কিনেছে, আমাদের চাই বারো ইঞ্চি ; জোন্‌স কিনলে নতুন শেভ্রোলে, সুতরাং স্মিথের মনে হল পুরনো গাড়িটা বেচে দিয়ে একটা ক্যাডিলাক আনতে না পারলে মান থাকে না। শুনেছি যাদের টেলিভিশনের পয়সা নেই তাদের কেউ কেউ শুধু একটা এরিয়াল বসিয়ে রাখে ছাতের উপর,—প্রতিবেশীরা ভিতরে এসে দেখতে চাইলে কি করে জানি না। পৃথিবীর লোকে কটাক্ষে বলে আমেরিকানরা খালি টাকাই চিনেছে (হয়তো এর মধ্যে কিছুটা ঈর্ষাও আছে)। এরা বলে টাকাই আসল নয়, উদ্যোগ আর অধ্যবসায় বড় কথা। সব দেশেই অধিকাংশ লোকে টাকা পেলে আর কিছু চায় না এ কথা কে অস্বীকার করবে ? আমার মনে হয় না আমেরিকানদের সংসারে সুখ কম অন্য দেশের তুলনায়।

এই প্রসঙ্গে কালচারের কথা ওঠে। কালচার যদি হয় শুধু জুতোর পালিশ আর মৌখিক ধন্যবাদ তাহলে এরা অন্য কোনো জাতির চেয়ে ছোট নয়। কিন্তু জাতীয় সংস্কৃতি বলতে যদি বুঝি

সেই সব জিনিস যার সঙ্গে দৈনন্দিন প্রয়োজন শারীরিক সুখ সুবিধার কোনো সম্পর্ক নেই, যদি বুঝি সেই সব সৃষ্টি যা আসে মানুষের উচ্চতর আকাঙ্ক্ষার তাগিদে, তবে এরা অনেক পিছনে পড়ে আছে। পাশ্চাত্য সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্র, নৃত্য ইত্যাদিতে এদের দান অপেক্ষাকৃত কম, যদিও মৌলিকতার চিহ্ন কিছু কিছু আছে। এরা বলে আমরা নতুন জাত, এখনো ঐতিহ্য গড়ে উঠবার সময় হয়নি।

জীবনযাত্রা সহজ এবং স্বচ্ছন্দ যখন হয়েছে কোনো জাতির তখনি তার শিল্পসৃষ্টি ও উপভোগ বেড়েছে। কিন্তু দরিদ্র য়োরোপের তুলনায় আমেরিকায় শিল্পের মর্যাদা নেই, সেজন্যই কালচারের খোঁটা শুনতে হয় ওদের। ইটালিতে সাধারণ লোকের অপেরা দেখতে যাওয়া আমেরিকায় সিনেমা দেখার মত স্বাভাবিক। আর্থিক স্বাচ্ছল্যের ফলে সাধারণ আমেরিকানের অবসর বিনোদনে ক্রমশই বাড়ছে শারীরিক উত্তেজনা আর চাঞ্চল্য—এদের ভাষায় having a good time অথবা having fun। এর মধ্যে খেলাধুলা ও স্বাস্থ্যকর কার্যকলাপের অনেক-খানি স্থান আছে সত্য, কিন্তু তার তুলনায় মননশীলতা বড়ই অনাদৃত। আমেরিকান রেডিও ইংলণ্ডের তুলনায় অনেক লঘু, —সিংহল বেতারের সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তারা তার আংশিক আন্দাজ করতে পারবে। আমেরিকার রেডিও

শ্রোতার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলে হাসিঠাট্টা করে, তা মন্দ লাগে না, কিন্তু ব্যাবসাদারী বিজ্ঞাপন এক এক সময় অত্যন্ত পীড়া দেয়। তা ছাড়া সস্তা নাচগানের তুলনায় অপেক্ষাকৃত গুরুপাক বিষয় এত বিরল যে মনে হয় সে দিকে বুঝি এদের রুচি নেই।

আমেরিকায় বর্ণভেদ এবং বিশেষ করে নিগ্রো সমস্যা নিয়ে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে মনে। বাইরের জগতের কাছে এই প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দেওয়া এদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। একথা সত্য যে দক্ষিণ অঞ্চলের কোনো কোনো প্রদেশে নিগ্রোদের পৃথক করে রাখা হয়েছে আইন করে; তাদের জন্য আলাদা স্কুল, ট্রেনে আলাদা গাড়ি—এমনকি টিকিটঘরও ভিন্ন। নিগ্রোদের অধিকাংশই এখনো শ্রমিক। কোনো কোনো জায়গায় আইন না থাকলেও হোটেলে ক্লাবে তাদের প্রবেশ নিয়ে গোলমাল হয়ে থাকে। লিঞ্চিংএর খবর মাঝে মাঝে শোনা যায়। গত মহাযুদ্ধের ফলে সেনাবাহিনীতে নিগ্রো পার্থক্য অনেকটা কমে গেছে; সম্প্রতি কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় তাদের গ্রহণ করেছে—কেউ স্বেচ্ছায় কেউ আইনের নির্দেশে। ওআশিংটনের বেশী দক্ষিণে আমার যাওয়া হয়নি কিন্তু ঐ শহরেও খানিকটা জাতিভেদ আছে বলে শুনেছিলাম। আমাকে কোনো অসম্মান সইতে হয়নি বা চোখেও কিছু পড়ে নি। শ্বেতাঙ্গের ট্যাক্সিতে

নিগ্রো সওয়ার, রেস্তরাঁতে নিগ্রোর সেবায় শ্বেতাঙ্গ পরিবেশিকা সেখানেও দেখেছি, যেমন চোখে পড়েছে উত্তরের প্রদেশগুলিতে। অবশ্য নিউ ইয়র্ক, বস্টন এবং আরো অনেক শহরে তারা বাস করে পৃথক পল্লীতে, সে সব এলাকায় শ্বেতাঙ্গ প্রায় চোখেই পড়ে না। কিন্তু কাজের সময় তারা মিশে যায় শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে সমস্ত শহরে, আপিশে কলেজে হোটেলে রেলগাড়িতে। কোনো রকম ভয় বা সংকোচ চোখে পড়ে না তাদের চলাফেরায়।

অপাঙ্‌ক্তেয় বর্ণের সঙ্গে একত্র কাজ করা আর একত্র বাস করার মধ্যে বোধহয় শ্বেতাঙ্গের চোখে অনেকখানি পার্থক্য। মনে পড়ে এক গল্প যা নিয়ে সংবাদপত্রে কিছুদিন বেশ হৈচৈ চলেছিল। চীনদেশে কমিউনিস্ট শাসন আসার পরে প্রাক্তন সেনাদলের এক অফিসার আমেরিকায় পালিয়ে আসে। শিক্ষিত যুবক সে, রাজনীতিও ঠিক আছে, সুতরাং কাজ পেতে তার দেরি হল না সাউথউড নামে এক জায়গায়। বিপদ হল বাড়ি ভাড়া করতে গিয়ে। প্রতিবেশীরা বেনামী চিঠি এবং অন্যান্য উপায়ে তাকে বুঝিয়ে দিলে যে সে পাড়ায় থাকা চলবে না। ছেলেটি উঠে যেতে রাজী নয়,—লিংকন ওআশিংটনের দেশে এ সম্ভব হতে পারে না! আমেরিকায় উচিত বিচার আর সমান অধিকার সম্বন্ধে কলেজে যা পড়েছে তার কথা বলে, শুভার্থী যারা ছিল তারা বলে বই আর বাস্তব এক জিনিস নয়। তবু

সে মানতে রাজী নয়,—অল্প কয়েকটি অশিক্ষিত সংকীর্ণমনা লোক তাকে যেতে বললেই সে যাবে না, ভোট নিয়ে এর মীমাংসা হওয়া উচিত। ভোটের ফলে ভীষণ হার হল তার। কিন্তু যাবার আগে প্রতিবেশীরা বিশেষ যত্নে এ কথাটা বুঝিয়ে দিল তাকে যে ব্যক্তিগতভাবে তার প্রতি তাদের কোনো আপত্তি নেই, শুধু ভয় যে non-Caucasian অশ্বেতাঙ্গ এখানে থাকলে পাড়ায় জমির দাম ভয়ানক কমে যাবে। এই কারণেই নিগ্রোদের বানাতে হয় হার্লেম শহরে শহরে।

এই ঘটনাটি নিয়ে বিতর্ক চলেছিল, ভোট হয়েছিল, তাই অনেকে জানতে পেরেছে। নীরব চোখের জলে অনেক দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয় সন্দেহ নেই। শুধু যে নিগ্রো বা এশিয়ার লোক নিয়ে তা নয়; দক্ষিণ বা পূর্ব য়োরোপের লোক যারা এদেশে এসে বাসা বেঁধেছে তাদের পক্ষেও এদের সঙ্গে সমান ভাবে মিশে যাওয়া ইংরেজ বা জার্মানের চেয়ে বেশী কঠিন। এমন কি সরকারী নিয়মেও বিদেশী আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা ভাগ করা আছে দেশ অনুসারে। এ ছাড়া ইহুদীদের দুর্গতি তো আছেই, কিন্তু তা আছে পাশ্চাত্যে প্রায় সর্বত্র।

এই যে গায়ের রঙের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, বর্ণ দিয়ে মনুষ্যত্ব বিচার এ অবশ্য নির্বোধ সংস্কার ছাড়া কিছু নয়। কিছুদিন আগে ইউনেস্কো-র উদ্যোগে এক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে জাতি বা বর্ণ অনুসারে মানুষের ক্ষমতা বা উৎকর্ষের কোনো রকম তারতম্য করা যায় না। কিন্তু অজ্ঞতা আর সংস্কারের বিরুদ্ধে তথ্য যে প্রায়ই অত্যন্ত দুর্বল তার প্রমাণ সব দেশে সব ঘরেই অল্পবিস্তর পাওয়া যাবে। কালোর তুলনায় ধলার প্রতি মানুষের আকর্ষণ তেমনি এক সংস্কার—কনে পছন্দ করার সময় আমরাও তা প্রকাশ করি। অনেকে আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ভাবে যাকে দেখতে ভাল সে লোকটাও ভাল, যে কালো সে হীন—বিপদ আরম্ভ হয় সেখানেই। অবশ্য মনুষ্য-চরিত্রের পরিবর্তন আসে শিক্ষার প্রসার আর সমাজের অমোঘ অবস্থা বিন্যাসের ফলে। আজ নিউ ইয়র্কে নিগ্রো যতখানি সাম্য পেয়েছে নিশ্চয় দাসত্বের দিনে তা ছিল না। এত গাঢ় কালো রঙের এতগুলি লোক যে শ্বেতাঙ্গের ভীড়ে এমন সহজ ভাবে চলাফেরা করছে এটা জানতে পারা আমেরিকা ভ্রমণের অন্যতম প্রধান এবং প্রসন্ন বিস্ময়। যারা আমেরিকার দুর্নাম করে বর্ণভেদ নিয়ে তাদের সমাজে সমস্যাটা এত বড় হয়ে দেখা দেয়নি কখনো, দিলে সেখানে নিউ ইয়র্কও আজ হত কিনা কে জানে!

যে গৃহকর্ত্রী ঘরভাড়ার বিজ্ঞাপন দিয়েছে সে যদি দরজা খুলে কালো চেহারা দেখে হঠাৎ চমকে যায়, বলে ঘর আর খালি নেই, তবে সে মানুষটা যে খুব মন্দ তা নয়, সেখানে

তার জন্মগত সংস্কারই প্রকাশ পাচ্ছে। পাশ্চাত্যবাসী প্রাচ্য-দেশীয়দের পক্ষে এ খুবই সাধারণ অভিজ্ঞতা। প্রথম প্রথম মাথা গরম হত, এখন দুঃখও বড় একটা হবে না। একদা ক্যানাডার এক সিনেমা-ক্লাবের সান্ধ্য অনুষ্ঠানে একটি মহিলা নির্দেশপত্র বিলি করতে করতে আমাকে বাদ দিয়ে গিয়েছিলেন। একটু পরে পাশের ভদ্রলোকটি সবিনয়ে তার কাগজটি আমাকে এগিয়ে দিলেন। কাগজ নেওয়া ও দেওয়ার মধ্যে তার ভাবে এতখানি সংকোচ ছিল যে অনুভব করলাম ব্যাপারটা তাকে আঘাত করেছে আমাকে না করলেও; এবং এই জিনিসটা আমার মনে দাগ কাটল অনেক বেশী ঐ ভদ্রমহিলার ব্যবহারের থেকে। আর যাই হক, দেশে দেশে লোকের ব্যবহারে আতিথ্য আর খাতিরই প্রায় সর্বদা চোখ পড়ে।

আমেরিকায় ভারতীয়দের সম্বন্ধে এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য। ইণ্ডিয়ান বলতে এরা এখনো বোঝে আমেরিকার আদিম অধিবাসী, সুতরাং নিজের পরিচয়ে আমাদের বলতে হয় 'ভারতের লোক'; 'আমি ইণ্ডিয়ান' না বলে বলা দরকার 'ইণ্ডিয়ার থেকে এসেছি'। সাড়ে চারশো বছর আগে কলম্বাস যে ভুল করেছিল আজো এঁরা তারই সূত্র ধরে চলেছে। এখনো কোনো কোনো সংবাদপত্রে ভারতীয়রা সাধারণভাবে 'হিন্দু' নামে অভিহিত।

যে আমেরিকা লক্ষ লক্ষ বিদেশী উদ্‌বাস্তুকে আশ্রয় দিয়ে ভাই বানিয়ে নিচ্ছে, যে আমেরিকা দেশে দেশে ঢেলে দিয়েছে অফুরন্ত ডলারের স্রোত, সেই দেশকে কেন বাইরের অধিকাংশ লোকে পছন্দ করে না, কেন সন্দেহ করে কেবলই, বর্তমান কালের এ এক অতি রহস্যপূর্ণ প্রশ্ন! এদের মধ্যে এ নিয়ে রাগ বিরক্তি দুঃখ এবং নিছক বুঝতে না পারার সন্দেহ ও দ্বন্দ্ব। যাদের জন্য এত করে তারাই চায় না দেখে অনেকের মন বিষিয়ে গেছে, অনেকেরই জিজ্ঞাসা এর হেতু সম্বন্ধে।

আমার মনে হয়েছে হেতু একটা নয়, অনেক। এবং তাদের প্রায় সবগুলিরই উদ্ভব সমষ্টির থেকে, ব্যক্তির থেকে নয়। ব্যক্তিবিশেষের সংস্পর্শ মুগ্ধ করে; সন্দেহ ও অসদ্ভাবের জন্ম সরকারী রাজনীতি, সংবাদপত্র ও বেতারের সুর থেকে, কিছুটা এদের জাতিগত রুচির থেকে।

একটা প্রবাদ আছে যে অপকার ভোলা সহজ কিন্তু উপকার ক্ষমা করা যায় না। তাই ভিক্ষার বিনিময়ে ভালবাসা পাওয়া যায় না, বড়জোর মেলে কৃতজ্ঞতা, কখনো বা ঘৃণা। যে সব দেশ পেটের দায়ে আমেরিকার কাছে হাত পাতে তাদের মধ্যে এই অদ্ভুত মনোবৃত্তি নিশ্চয় কিছুটা বিদ্যমান। কিন্তু এতে আমেরিকা খুশী হবে এমনও আশা করা চলে না।

এদের বিরক্তি কখনো অন্য কারণেও বাড়ে। কংগ্রেস যখন ভারতে গম পাঠানো মঞ্জুর করলে তখন ছু একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে এ কথা সত্যি কিনা যে আমাদের দেশে মানুষের খাবারে জন্তু জানোয়ারে ভাগ বসায়? ষাঁড় বা বানরের জন্য পৃথিবীর ওপারে খাবার পাঠাবার বিশেষ ঠেকা নেই এমন কথা কেউ মনে করলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। যেখানে নরেরই মন পাওয়া যায় না সেখানে বানরের সেবায় কী লাভ!

কালচারের প্রসঙ্গ আগে আলোচনা করেছি। এদের লঘুতা এবং আর্থিক মোহের প্রতি কটাক্ষ করেও অনেকে এ জাতিকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। যে জাতি বিশ্বকে দিয়েছে শুধু কোকা কোলা আর কমিক তার এখনো বয়স হয়নি, ভাবটা এই। এই কমিক ছবির প্রভাব ও জনপ্রিয়তা দেখে বিস্ময় কাটতে চায় না। প্রতি বছর কমিকের বই যা ছাপা হয় ওজনে তা একসঙ্গে আর সমস্ত বিষয়ের বইকে হার মানাবে। এবং শুধু শিশুরাই নয়, বয়স্করাও ছুনিয়া ভুলে যায় সংবাদপত্রের কমিক পৃষ্ঠা খুলে। শুনেছি তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা খবর পড়বার সময় পান না। কমিকের প্রসিদ্ধ চরিত্র L'il Abner এতকাল ছিল অবিবাহিত, হঠাৎ একদিন কাগজে দেখা গেল সে সংসারী হয়েছে। দেখতে দেখতে দেশ ছুভাগ হয়ে গেল সমর্থনে আর প্রতিবাদে; জনমতের বিভিন্ন অভিব্যক্তিতে আনন্দ আর

শোকের বন্যা বয়ে চলল দিনের পর দিন। যদি কাগজে সেদিন থাকত কোথাও আণবিক বোমাপাতের খবর তাহলেও এত লোকের মন এমন চঞ্চল হত কিনা সন্দেহ। দেখে শুনে মনে হয় এত বড় বাস্তব জগতটার সুখদুঃখের চেয়ে L'il Abnerএর ঘরোয়া ব্যাপারে আমেরিকানদের গরজ বেশী। কমিক আজ ওখানে প্রকাণ্ড ব্যাবসা—শুধু খবরের কাগজে নয়, বই বেতার টেলিভিশন এবং সিনেমায় পর্যন্ত। তাছাড়া জামা কাপড় এবং ব্যবহারের অন্যান্য জিনিসেও তা বিস্তৃত হয়েছে, বিদেশে ডালপালা ছড়াচ্ছে। কমিক-শিল্পীরা লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করেন, দেশে তাদের খুব আদর।

বিদেশীয় বিদ্বেষের আরেকটা বড় কারণ এদের পররাষ্ট্রনীতি। চরম দক্ষিণপন্থা আশ্রয় করে একেবারে অনড় ও একরোখা হয়ে বসে থাকা এবং বিপক্ষকে সব কিছুর জন্য দোষী করা গালাগালি করা, অনেকের বিচারে এতে বিশ্বশান্তির আশা ক্রমেই ক্ষীণ হচ্ছে। নতুন চীনকে না মানা এই মনোভাবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমেরিকা বলে শুধু স্বাধীন দেশ হওয়াই যথেষ্ট নয়, 'উপযুক্ত' হতে হবে। অনেকেই বোঝে না যে তাহলে সেই কারণেই রুশ বা য়ুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গেও রাজনৈতিক আড়ি করে না কেন সে, অথবা জাতিসংঘ থেকে তাদেরও নিষ্ক্রান্ত করা হয় না কেন?

আন্তর্জাতিক সমস্যার ক্ষেত্রে সম্প্রতি প্রায়ই দেখা যায় যে

সমষ্টির স্বার্থের চেয়ে কোনো নেতা বা ব্যক্তিবিশেষের সম্ভ্রমের প্রশ্নই যেন বড় হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারেও আমেরিকার দান কম নয়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যদি বলেন যে তিনি স্টালিনের সঙ্গে কথা বলতে রাজী আছেন কিন্তু তাকে আসতে হবে এদেশে, তবে জগতের লোক ভাবতে পারে যে এই সামান্য কারণে তাদের সুখ শান্তির পথে কাঁটা পড়বে এটা অন্যায় এবং অনুচিত। তার-পর আমেরিকার নেতারা কংগ্রেসের সদস্যরা বিদেশ সম্বন্ধে মাঝে মাঝে বেশ অপমানকর উক্তি করে থাকেন। য়োরোপ এশিয়ার কথা ছেড়েই দিলাম, কিছুদিন আগে এক কংগ্রেসম্যান বিল প্রস্তাব করেছিলেন যে ইংলণ্ডের যুদ্ধ-ঋণের পরিবর্তে ক্যানাডাকে আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হক। পরে সাংবাদিক-মহলে তিনি বললেন ক্যানাডা যে স্বাধীন দেশ তা তার জানা ছিল না। এর ফলে 'সুহৃদ প্রতিবেশী' ক্যানাডাও দিনের পর দিন সংবাদ-পত্রে ও বেতারে যা সব মন্তব্য করেছে এবং সাধারণ লোকের কথায় যা ঝাল প্রকাশ পেয়েছে তা প্রত্যক্ষ দেখে জগতের অন্যত্রের কথা ভাবতেও শিহরণ হয়।

প্রপাগাণ্ডার পিছনে কিছুটা মনস্তত্ত্ববোধ থাকা দরকার। লৌহপর্দার দুদিক থেকেই আজ যে প্রপাগাণ্ডার ঝড় বয়ে চলেছে তার ঘূর্ণিতে পড়ে সাধারণ লোকের মাথা ঠিক রাখা কঠিন, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো কোনো উক্তি হজম করা দুরূহ। যে সব

আমেরিকানকে কমিউনিস্টরা এযাবৎ গুপ্তচর বলে বন্দী করেছে তাদের সবাই যদি নির্দোষ হয় তবে একথা মানা প্রায় দরকার হয়ে পড়ে যে আমেরিকার গুপ্তচর নেই। অথচ চলচ্চিত্রে এবং বইপত্রে বহু আমেরিকান বীরের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে যারা শত্রুর দেশে গিয়ে গোপনে তাদের সব ষড়যন্ত্র নষ্ট করলে। তারপর, কমিউনিস্ট দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসে যারা মাঝে মাঝে আমেরিকার আশ্রয় ভিক্ষা করে তাদের অনেকে হয়তো অত্যাচারের ভয়েই দেশ ছেড়েছে, কিন্তু এও হতে পারে যে কখনো কখনো ঐ অজুহাত আমেরিকায় ঢুকবার 'শর্টকাট'। এই প্রাচুর্যের দেশ লোভ জাগায় অনেকের, কিন্তু সাধারণ উপায়ে ঢোকার দরজাটা সরু, অনুমতির জন্য অপেক্ষা করতে হয় অনেক দিন।

আমেরিকার অভিযোগ যে কমিউনিস্ট দেশে চলাফেরায় অনেক বাধা। অথচ বিদেশী পর্যটকের পক্ষে আমেরিকার প্রবেশপত্র পাওয়া এখন বেশ কষ্ট ও সময় সাপেক্ষ এক নতুন আইনের ফলে। শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত কখন কোন জায়গায় বাস করেছে আগন্তুককে তার তারিখ ও ঠিকানা দিতে হয়। বলা বাহুল্য এমতাবস্থায় মিথ্যা শপথের দায়ে পড়বে না এমন আশ্চর্য স্মরণশক্তি খুব কম লোকেরই আছে। এছাড়া সব আঙুলের ছাপ —একযোগে এবং পৃথক—দিতে হয়েছিল আমাকে দুই কিস্তিতে। অনেক রকম দলিলপত্র দাখিল করার পর, প্রায় এক ডজন স্বাক্ষর

ও স্বদেশ বিদেশে নানা অনুসন্ধানের পর ভিসা পাবার যখন সময় হল প্রায় দেড় মাস বাদে, তখন হাত তুলে শপথ করতে হল ঈশ্বরের নামে যে মিথ্যা বলিনি কিছু, যদিও কাগজে কলমে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আগেই। এসব যদি প্রয়োজন হয় আমেরিকার নিরাপত্তার জন্য তবে রুশও বলতে পারে সেই কথা —এবং তাদের শত্রু যে আমেরিকার চেয়ে বেশী তা আমেরিকা নিজেই স্বীকার করবে।

কমিউনিজমের গন্ধ বা সন্দেহ কোনো দিন যাদের গায়ে লেগেছে তাদের প্রবেশ নিষেধ এদেশে অল্পদিনের জন্যও। এ দলে আছেন অনেক বৈজ্ঞানিক ও শিল্পী, যাদের কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে কখনো সম্পর্ক ছিল না রাজনীতির। এই শ্রেণীর আমেরিকানরাও বিদেশে যাবার ছাড়পত্র পান না। সেনেটার ম্যাকার্থির উদ্যোগে এদের সংখ্যাও ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কেরানী শিল্পী শিক্ষক যাজক আজ সবাই তটস্থ জুজুর ভয়ে। বিদেশে আমেরিকার মানহানির সব চেয়ে বড় কারণ সেনেটার ম্যাকার্থি একা।

রাজনীতিতে কথা ও কাজের তারতম্যও প্রায়ই চোখে পড়ে এদেশে। আমেরিকা যে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী তা এশিয়া ও আফ্রিকা বহু দিন ধরে শুনে আসছে। অথচ জাতিসংঘের ভোটে সে সর্বদা ইংলণ্ড ফ্রান্স হলাণ্ডের দলে,—কারণ এঁর পরিবর্তে

হয়তো চীনের নির্বাসন ব্যাপারে ঐ বন্ধুদের ভোট দরকার। অবশ্য power politicsএর কাছে নীতির পরাজয় পৃথিবীর অন্যত্রও প্রায়ই চোখে পড়ে।

আমেরিকান রাষ্ট্রসংবিধানের এক নীতি প্রায়ই শোনা যায় বক্তৃতায় বেতারে, পড়া যায় বইয়ে সংবাদপত্রে যে সব মানুষ সমান হয়ে জন্মায়। জাতিসংঘের অর্থ নৈতিক-সামাজিক বিভাগে (Ecosoc) এক আলোচনা শুনছিলাম একদিন, ঐ নীতির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে বলে আজ আমেরিকার সমাজ সোভিয়েটের তুলনায় এত শ্রেয় একথা বললেন আমেরিকার সদস্য। তার অল্পদিন আগে রিপাবলিকান পার্টির অধিবেশন হয়ে গেছে প্রেসি-ডেন্ট প্রতিযোগিতার সদস্য নির্বাচনের জন্য। সেই সভায় একটি প্রস্তাব আনা হয় যে জাতি, বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে সব লোকের জীবিকার অধিকার ও সুযোগ সমান হওয়া উচিত—সোজা কথায় চাকরিতে লোক নেওয়ার সময় একমাত্র কর্মক্ষমতাই বিবেচ্য। প্রস্তাবটি গ্রাহ্য হয়নি।

মনে পড়ে জাতিসংঘের সেই সভায় দেশের বাসব্যবস্থা ও খাদ্যমানের উন্নতির প্রমাণস্বরূপ আমেরিকার প্রতিনিধি এও বলেছিলেন যে ক্ষয়রোগে মৃত্যু কমে গেছে। সেই দিনই সকালে নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স পত্রিকায় এক খবরে বলা হয়েছিল যে এটা হয়েছে নতুন ওষুধ আবিষ্কারের ফলে; ক্ষয়রোগের আক্রমণ

কমে নি—আরোগ্যের সংখ্যা বেড়েছে অথবা রোগীর আয়ু প্রলম্বিত হয়েছে মাত্র। বলা বাহুল্য এতে প্রমাণ হয় না যে সাধারণ স্বাস্থ্য বা স্বাভাবিক প্রতিরোধ-শক্তির উন্নতি হয়েছে। নতুন ওষুধের ফলে এখন ক্ষয়রোগে মৃত্যু সব দেশেই কম আগের চেয়ে।

আর বাড়িয়ে লাভ নেই, এ সব দোষ অন্যান্য দেশেও আছে, কিন্তু কম মাত্রায়। ভাবলে দুঃখ হয় যে প্রধানত রাজনীতির চক্রান্তে বিদেশে আমেরিকা-বিদ্বেষ গড়ে ওঠে, সাধারণ লোক সম্বন্ধে এমন ধারণা প্রসারিত হয় যার অধিকাংশই মিথ্যা। আমেরিকায় আমার সব চেয়ে বড় অভিজ্ঞতা এই সত্যের আবিষ্কার যে আতিথ্য, বন্ধুত্ব, ঔদার্য এবং অন্তর্নিহিত সাম্যবোধে এরা কোনো জাতির খাটো নয় বরং অনেকের বড়। সাধারণ লোকের মধ্যে যে ঔদ্ধত্য আশঙ্কা করেছিলাম প্রসন্ন বিস্ময়ে দেখলাম তার চিহ্ন নেই। মানুষ সর্বত্রই প্রায় এক, কিন্তু দূর থেকে কত সহজেই ভুল ধারণা জন্মায় বিদেশ সম্বন্ধে!

যে জিনিসটা এদের মধ্যে সব চেয়ে ভাল লেগেছে পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশের তুলনায় তা হল পরস্পরের প্রতি এদের স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত সাম্য ও মানবিকতাবোধ। এক রেস্তরাঁয় মাঝে মাঝে খেতে যেতাম, সেখানে সকালে যে লোকটি বাসন ধোয়ার কাজ করত বিকালে সে সেজেগুজে আসত বেড়াতে। দোকানের

মালিকের সঙ্গে পাশাপাশি বসে কফি খেত, হাসি গল্প করত, কোনো কোনো সন্ধ্যায় এক সঙ্গে বেড়াতে যেত তারা। এটা উত্তর আমেরিকা ছাড়া আর কোথাও সম্ভব বলে আমি জানি না। ইংলণ্ডে ও য়োরোপেও ছোট বড়র মধ্যে আমাদের মত অধিকার ভেদাভেদ নেই কিন্তু সেখানেও পারস্পরিক ব্যক্তিগত ব্যবহারে জড়তা বেশী আমেরিকার চেয়ে। বয়সের আর মর্যাদার ব্যবধান ডিঙিয়ে এরা অনায়াসে নাম ধরে ডাকে, দিলখোলা আলাপ করে—এদের সামাজিকতা সহজ ও স্বাভাবিক।

ক্যানাডা

প্রবলপ্রতাপ যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার ছায়ায় বর্তমান জগতে ক্যানাডাকে অনেকের ভাল করে চোখেই পড়ে না। কারো মনে উত্তর মেরুর কাছাকাছি জনবিরল এক তুহিন দেশের অস্পষ্ট ছবি, কেউ ভাবে ক্যানাডা আর মধ্য আমেরিকার সংস্কৃতি রীতিনীতি ইত্যাদিতে পার্থক্য বিশেষ কিছু নেই।

এই ধারণার মধ্যে সত্য যে অনেকখানি তা অস্বীকার করা যায় না কিন্তু এমন কথা ভাবাও খুব ভুল হবে যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবে ক্যানাডা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন এবং তার নিজস্ব যা কিছু তা নগণ্য। ক্যানাডা যদি একদিন কনিষ্ঠের জায়গা থেকে জ্যেষ্ঠের স্থানে উন্নীত হয় তবে আমি আশ্চর্য হব না (অবশ্য তখন সম্ভবত আমি থাকবও না আশ্চর্য হবার জন্য)। এই সম্ভাবনার কী কারণ তা ক্রমে বলব।

ওদেশে পৌঁছাবার অল্প কয়েকদিন পরে এক চা-আসরে ওদের এক প্রোফেসার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ক্যানাডার কোন তিনটি বিশেষত্ব আমার চোখে লেগেছে সবচেয়ে বেশী।

জবাবটা কী দিয়েছিলাম তা ঠিক মনে পড়ছে না তবে সেটা যে খুব যথার্থ হয়নি তা বলা চলে, কারণ তখনো ওদেশের সঙ্গে আমার ভাল করে পরিচয় হয়নি এবং দ্বিতীয়ত এই ধরণের আসরী প্রশ্নের উত্তরে সাধারণত ভদ্রতাসঙ্গত মিষ্টি কথা বলতে হয়। বোধহয় তার দেশের লোকের সুন্দর ব্যবহারের উল্লেখ করেছিলাম, কিন্তু সেটা কিছু আশ্চর্য বস্তু নয়, দেশে দেশে তার সাক্ষাত মেলে। আজ ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করব।

দক্ষিণের প্রতিবেশীর তুলনায় ক্যানাডার তিনটি বৈশিষ্ট্য জলবায়ু, ফরাসী প্রভাব এবং ব্রিটিশ কমনওএল্‌থ-এর সঙ্গে যোগ থাকার জন্য সমাজে কিছুটা ইংরেজিয়ানা। দেশ প্রকাণ্ড, সেজন্য আবহাওয়া সর্বত্র সমান নয়, কিন্তু যে জিনিসটা বাইরের লোকে সাধারণত জানে না তা হল অনেক অংশে গ্রীষ্মকালে অসহ্য গরম পড়ে। দক্ষিণ-মধ্য অঞ্চলে তিনটি প্রশস্ত প্রদেশ জুড়ে ক্যানাডার প্রধান শস্যক্ষেত্র এবং এসব জায়গায় বছরের প্রায় ছমাস গ্রীষ্ম ছমাস শীত। তাপ চড়ে যায় ১২০ ডিগ্রির কাছাকাছি এক ঋতুতে, আবার শীতকালে হয়তো দিনের পর দিন থাকে শূন্যের ৪০ ডিগ্রি নিচে—অর্থাৎ যে ঠাণ্ডায় জল জমে তার ৭২ ডিগ্রি কম। শীতের আকাশ কিন্তু ইংলণ্ডের মত বিষণ্ণ নয়, প্রায়ই রোদ ওঠে বেশ। উত্তরে আছে য়ুকন ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তভূমি, সেখানে অবশ্য শীত আরো বেশী,

প্রধানত এস্কিমো আর ইণ্ডিয়ানদের বাস, ব্যাবসা বাণিজ্য বা লোকের আনাগোনা খুব কম। জ্যাক লণ্ডনের গল্পের সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তারা কিছুটা অনুমান করতে পারবে এসব অঞ্চলের নির্দয় প্রকৃতি আর রূঢ় কঠিন জীবন।

পশ্চিমে ও পুবে সমুদ্রের দিকে গেলে ক্রমশ শীত গ্রীষ্মের প্রখরতা আসে কমে। প্রশান্ত মহাসাগর উপকূলে ব্রিটিশ কলাম্বিয়া প্রদেশে এবং তার কাছাকাছি দ্বীপে ইংরেজী ক্যানেডিয়ানদের বাস বেশী, অনেক জায়গা প্রায় ইংলণ্ডেরই প্রতিচ্ছবি। শুধু যে আবহাওয়া মৃদু তাই নয়, উপকূলের দিকে রোদ কম ও আকাশ বেশী ঘোলাটে—বোধহয় তাতেও ইংরেজদের দেশের কথা মনে পড়ে। পূর্বাঞ্চলে ফরাসীদের ঘাঁটি, কেবেক প্রদেশে শতকরা নব্বইয়ের বেশী লোক ফরাসী ভাষা বলে। উত্তর আমেরিকায় একমাত্র কেবেক শহরে য়োরোপীয় পুরনো জগতের ছাপ কিছু কিছু চোখে পড়ে। ফরাসী প্রভাবের জন্য ক্যাথলিকদের অংশও ক্যানাডায় বেশী যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায়।

এদের বাসব্যবস্থাও অবশ্য আবহাওয়ার রূঢ়তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়েছে। শীতের দিনে ঘন ঘন এত বেশী বরফ ঝরে যে রাস্তাঘাট পরিষ্কার করে গাড়ি ও লোকজনের চলাফেরার ব্যবস্থা খোলা রাখা এক বড় সমস্যা। রকমারি যন্ত্র আর বরফ-কোদাল গভীর রাতে কাজ করে চলে বরফ সরাবার জন্য,

সকালবেলা ফুটপাতের উপর বালি অথবা করাতের গুঁড়ো ছড়ানো থাকে পদাতিকের সুবিধার জন্য—অবশ্য এত করেও দুর্ঘটনা একেবারে বন্ধ হয় না। কলকাতায় প্রতি বর্ষায় বেশ কয়েকদিন লোকের চলাচল কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, এখানে কিন্তু বরফের এত উপদ্রবেও ট্রাম কখনো বন্ধ হতে দেখিনি।

ঘরে এমন আরাম যে শুধু শার্ট পরেই থাকতে ভাল লাগে, ট্রাম বাসের ভিতরটাও বেশ গরম করা, কষ্ট হয় শুধু বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে চড়া পর্যন্ত। শূন্যের বেশ নিচে যখন শীত তখন তার সঙ্গে যদি হাওয়া বইতে থাকে তবে ঐ কয়েক মিনিট বাইরে থাকতেই বেশ কষ্ট হয়, নানারকমের ঢাকাঢুকি সত্ত্বেও। শীতের মাত্রার সঙ্গে পোশাকের সম্পর্ক এসব দেশে বেশ অনুশীলন করা চলে। ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ হলে প্রথমে ভারি মোজা, তারপরে একে একে দস্তানা, গলাবন্ধ, ওভারকোট, জুতোর উপরে রবারের জুতো, কানবন্ধ। মাথা ঢাকা যাদের দরকার হয় তাদের জন্য অনেক রকম উষ্ণ টুপি—রোমশ চামড়ার ভারি শিরস্ত্রাণ পর্যন্ত। ইংলণ্ডের শীতে ওসব দেখা যায় না, সেখানে ওভারকোট পর্যন্ত যথেষ্ট, তাও অপেক্ষাকৃত হালকা। এরা অবশ্য ইংলণ্ডকে শীতের দেশ বলে গণ্য করে না, তবে শুনেছি স্টকহল্‌ম বা মস্কোর শীত অনেকটা এই রকম। বিলেতে শার্টের নিচে পশমী জামা পরাই রীতি, এদের সুখোষ্ণ ঘরে ওতে অস্বস্তি হয়।

বেশী শীতে সবচেয়ে জ্বালা হয় হাতপায়ের আঙুল আর কান নিয়ে। অনেক দিন আগে এক ক্যানেডিয়ান মহিলা আমাকে বলেছিলেন তার দেশে এত শীত যে মাঝে মাঝে কানটা খসে পড়ে যায়। তখন মনে মনে হেসেছি কিন্তু পরে এমন দিনও এসেছে যে পথে চলতে চলতে যদি হঠাৎ দেখতাম কানটা পড়ল মাটিতে তবে খুব আশ্চর্য হতাম না। নাকও অসাড় হয়ে আসে, কখনো নিশ্বাস জমে বরফ হয়ে নাক বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। বেশীক্ষণ ঠাণ্ডা লাগলে হাতপায়ের ও মুখের এই অগ্রভাগগুলি চিরকালের মত অসাড় হয়ে পড়তে পারে রক্ত চলাচলের অভাবে। অবশ্য শীতকালে সব দিনই এমন মারাত্মক নয়, ঠাণ্ডা যখন শূন্যের দশ পনেরো ডিগ্রি নিচে তখনো ভাল করে গরম জামা পরে ঘুরে বেড়াতে ভালই লাগে, অবশ্য কনকনে হাওয়া যদি না থাকে।

অবশেষে সুদীর্ঘ শীতও একদিন বিদায় নেয়, কিন্তু অনেক অঞ্চলেই বসন্তের সান্ত্বনা অত্যন্ত ক্ষণিক। ইংলণ্ডের বসন্ত যে দেখেছে তার পক্ষে তা এক ভীষণ ব্যর্থতা। এপ্রিলের বরফ গলতে না গলতেই যেন গরম পড়ে যায়, ক্রোকাস ফুটতে না ফুটতে আসে গোলাপ। কিন্তু প্রকৃতির কী যে আশ্চর্য ইঙ্গিত, একই দিনে বসন্ত যেন আসবেই—শীত যদি জায়গা ছেড়ে দিতে দেরি করে তাহলেও; তাই বরফের প্রলেপের তলা থেকে ক্রোকাসের কুঁড়ি যখন মাথা গজায় তখন সামান্য বীজের

চেতনার কথা ভেবে অবাক লাগে ; কে যেন তাকে বলে দিয়েছে এইবার তার পালা এসেছে, বাইরের তাপ উত্তাপকে অগ্রাহ্য করে তাই সে নিজের দাবি জানায় !

শীতের দিনে যেমন ভারি পোশাক গ্রীষ্মে তেমনি চলে ফুরফুরে হালকা জামাকাপড় য়োরোপে যা প্রায় পরাই চলে না। সিনেমা দোকান রেস্তরাঁ ইত্যাদিতে তখন আসে ঘর জুড়ানোর দিন। বাড়ির গঠনও এখানে য়োরোপের থেকে কিছুটা অন্য রকম, যেমন সামনে বারান্দা—গ্রীষ্মের বিকেলে পরিবারের অনেকটা সময় কাটে সেখানে। বৈদ্যুতিক পাখা য়োরোপে প্রায় দেখাই যায় না, এখানে অনেক ঘরে আছে টেবিল পাখা।

দক্ষিণে যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়াও মোটামুটি এই রকম, কিন্তু শীত ঠিক এতখানি প্রখর নয়। ক্যানাডার শীত সম্বন্ধে শুধু দূর দেশের নয় দক্ষিণের প্রতিবেশীদের মনেও একটা ভয় আছে। এদের বাঁধা গল্প যে আমেরিকানরা এখানে বেড়াতে এলে ভরা গ্রীষ্মেও স্কী আর বরফের জুতো আনতে ভোলে না।

প্রকৃতি যেখানে সদয় সেখানে জায়গা ভরে গেলে তবে মানুষ অন্যত্র নজর দেয়। তাই ক্যানাডা আজ নতুন দেশ, সবে গড়ে উঠছে তার নতুন জাতি। বাইরের রূঢ়তার আড়ালে কিন্তু ক্রমে প্রকৃতির অজস্র দান ধরা পড়ল। এদের খেতে আজ এত

শস্য, খনিতে এত তেল ও ধাতু, বনে এত গাছ যে ঘরের প্রয়োজনের তা অনেকগুণ বেশী। গম ভুট্টা পেট্রল নিকেল ইউরেনিয়াম কাগজ এ সবের রপ্তানির উপর ক্যানাডার স্বাচ্ছল্য আজ দ্রুত গড়ে উঠছে। পৃথিবীর আর কোনো দেশে বোধহয় জনসাধারণের অবস্থা এত দ্রুত উন্নত হচ্ছে না। তুনিয়ার বণিকদের টাকা এসে জমছে এদেশে কারণ নতুন উদ্যোগের এমন সুন্দর ক্ষেত্র আর কোথায়! কমিউনিজম প্রায় নেই বললেই চলে, অধুনাতম এঞ্জিনিয়ারিং এবং কলকব্জার কৌশল এদের জানা আছে এবং মাটির নিচে অনাবিষ্কৃত সম্পদ যে এখনো কত আছে তার হিসেব নেই। অন্যান্য দেশ শুকনো মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে হয়রান হচ্ছে তেলের আশায়, এদেশে যেখানে হক একটা গর্ত খুঁড়লেই যেন তেল বেরিয়ে আসে ছুটে।

অন্য দেশে লোকে ঠেলাঠেলি করে বাস করে, বিদেশে যায় নতুন ঘর বানাতে,—এদের জনসংখ্যা এত কম যে দেশ গড়ার কাজে তা এক বড় বাধা। আয়তনে ক্যানাডা বোধহয় তার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেশীর ছোট নয় কিন্তু লোক মোটে তার দেড় কোটি—আমেরিকার এক দশমাংশ। সেইজন্য দিনের পর দিন জাহাজের পর জাহাজ য়োরোপের লোক এনে নামাচ্ছে এদের ঘাটে ঘাটে; তারা কাজে লাগছে সঙ্গে সঙ্গে খেতখামারে কারখানায় হোটেলে গৃহস্থঘরে। যে জাহাজ আমাকে

হ্যালিফ্যাক্স বন্দরে নামাল তার শতকরা পঁচানব্বই জন যাত্রী ছিল এই দলের লোক। বলতে গেলে সে এক ক্ষুদ্র য়োরোপ— ইংলণ্ড জার্মেনি পোলাণ্ড রুশ ফ্রান্স ইত্যাদি ছোট বড় নানা দেশের লোক মিলিয়ে কত রকম ভাষা, মুখের গঠন আর ঐতিহ্য! সব দেশের মধ্যে সংখ্যা ভাগ করা আছে, ইংরেজ আর উত্তর য়োরোপীয় লোকেরই আদর বেশী। অধিকাংশই অবশ্য আশ্রয় খোঁজে আমেরিকায়, না পেলে অথবা দেরি হবে মনে হলে আসে ক্যানাডায়।

জাহাজে আমার কামরার সঙ্গী ছিল এক রুশ যুবক, আলাপ জমিয়ে সতর্ক চেষ্টায় ক্রমে তার ইতিহাস কিছু কিছু জানা গেল। ইউক্রেনে বাড়ি, রুশকে নিজের দেশ বলে মানতে সে রাজী নয়, বলে স্বাধীনতা চাই। সরকারের অত্যাচারের কথা অনেক কিছু বললে, কাগজে যেমন পড়ি; সাধারণ লোকের স্বাধীনতা খুব কম, গুপ্ত পুলিশের ভয়, ইত্যাদি। সেটাই তার প্রধান অভিযোগ, বলে সাম্য দিয়ে কি হবে যদি স্বাধীনতা না থাকে। ইচ্ছে করেই অপর পক্ষের হয়ে তর্ক করতাম তার সঙ্গে, সংস্কার বা প্রপাগাণ্ডা এর মধ্যে কতখানি তা জানবার জন্য। ইউক্রেনের লোক যদি রুশ-বিরোধী তবে 'জার্মানরা সেখানে হেরে গেল কেন এই প্রশ্নের জবাবে সে বললে তা হয়েছে জার্মানদেরই দোষে; প্রথমে অনেকেই অস্ত্র ত্যাগ করে জার্মানদের দলে যোগ

দিয়েছিল কিন্তু দেখা গেল অত্যাচারে তারা রুশদেরও হার মানায়, সুতরাং লোকের মন উঠল বিষিয়ে।

আমেরিকান বাহিনী যখন এল কাছাকাছি তখন একদিন সে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিল তাদের কাছে। জার্মেনিতে আমেরিকান স্কুলে সে শিখল যন্ত্রের কাজ আর ইংরেজী—অবশ্য মার্কিন ও স্লাভ উচ্চারণ মিশ্রিত ঐ অদ্ভুত ভাষাকে ঠিক ইংরেজী বলতে একটু দ্বিধা হয়। ক্যানাডার টরণ্টো শহরে আছে তার কাকা, সে কাজ ঠিক করেছে তার জন্য কারখানায়। এখন থেকে ক্যানাডাই তার মাতৃভূমি। এরা কিন্তু সহজে ঠিক একেবারে মিশে যায় না দেশের লোকের সঙ্গে—বিশেষ করে দক্ষিণ ও পূর্ব য়োরোপের লোকেরা। জাতীয় ও সামাজিক বিশেষত্ব অনেকখানি বজায় রেখে নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণত জীবন কাটায়, মাঝে মাঝে একটু আধটু অপমানও যে গায়ে লাগে না তা নয়। এদের ছেলেরা নাতিরা ক্রমে শিকড় গজায় 'নয়া পৃথিবী'র মাটিতে।

এক পরিবারের সঙ্গে কিছুদিন এক বাড়িতে ছিলাম, তারা লাটভিয়া ছেড়ে চলে এসেছে দেশটা সোভিয়েট দখলে যাবার পরে। ক্যানাডাতে বেশ স্বচ্ছলভাবেই দিন কাটছে তাদের কিন্তু সুখ নেই স্বামী স্ত্রীর মনে। আমার কাছে দেশের কথা বলতে বলতে ভদ্রলোকের চোখে জল আসত বারে বারে,

বলতেন আবার যদি কখনো পুরনো দিন আসে তবে তখনি ফিরে যাবেন এখানকার সব আরাম আর স্বাচ্ছল্য ছেড়ে। কিন্তু তাতে তাদের বারো বছরের ছেলে নিশ্চয় খুব আপত্তি করবে, সে এখানে আছে বেশ মনের সুখে।

এমনি করে আজ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভারকেন্দ্রও পাড়ি দিচ্ছে য়োরোপ থেকে উত্তর আমেরিকায়। আর্থিক স্বাচ্ছল্য আর সুন্দর বাসব্যবস্থার লোভে বহু বৈজ্ঞানিক দার্শনিক শিল্পী এই মহাদেশে এসে বাসা বেঁধেছেন। ইংলণ্ডের বিজ্ঞান জগত এই সমস্যা নিয়ে বেশ চিন্তান্বিত। যে আর্থিক-ঐতিহাসিক নিয়মে বিশ্বের রাজনৈতিক প্রভুত্ব আজ প্রথম প্রতিষ্ঠিত এই মহাদেশে, তারই ফলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির শিকড়েও পড়েছে টান। বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের ভার এরই মধ্যে আমেরিকার দিকে ঝুঁকে পড়েছে—নোবেল পুরস্কারের সাম্প্রতিক তালিকা দেখলে তার মাত্রা কিছুটা বোঝা যায়,—সাহিত্য চিত্র সঙ্গীতেও এর পরে অর্থ-দরিদ্র য়োরোপ অন্ধকারে পড়ে গেলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আগের দিনে মানুষের সভ্যতা সরেছে শহর থেকে শহরে, তারপর দেশ থেকে দেশে, আজ এই রকেট-বিমানের যুগে মনে হয় সে মহাসাগর পাড়ি দিতে প্রস্তুত। আমেরিকার এই প্রথম অভ্যুদয়ে আজ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে এসেছি হয়তো আমরা।

এমনকি ক্যানাডার পর্যন্ত সমস্যা কি করে তার স্বল্পসংখ্যক বৈজ্ঞানিক শিল্পী ভাবুকদের ঘরে রাখা যায়। অনেকেই যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে বাস করছে কারণ ক্যানাডায় জীবনযাত্রা ঠিক অতখানি সহজ নয় এখনো, জিনিসের দাম একটু বেশী, মাইনে একটু কম; ক্যানাডায় প্রতি তিনজনের একজন গাড়ির মালিক নয়। খুব সম্প্রতি অবশ্য এক নতুন আশা দেখা দিয়েছে, ব্যাবসা বাণিজ্যের প্রসারের ফলে বিদেশী টাকা এত এসে জমা হয়েছে এদেশে যে ছুনিয়ার সর্বাগ্রগণ্য মুদ্রা আমেরিকান ডলারের চেয়েও ক্যানাডার ডলারের দাম গেল বেড়ে। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার পর ছুই দেশেরই মুখের ভাব বেশ দেখবার মত হয়েছিল। আমেরিকান পর্যটক পৃথিবীর সর্বত্র তার টাকার আদরে অভ্যস্ত, ক্যানাডাতেও পেয়ে এসেছে একশোর বদলে প্রায় একশো পাঁচ, হঠাৎ তা যখন কমে হল আটানব্বই এবং তার পরেও পড়তে লাগল নিচে, তারা মোটেই পছন্দ করেনি সেটা। অন্যদিকে রাতারাতি ক্যানাডার লোকের বুক ফুলে গেল দ্বিগুণ—এ এক সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা তাদের জীবনে।

এই অবস্থায় গর্ব বোধ করা সব দেশের পক্ষেই স্বাভাবিক, ক্যানাডার পক্ষে বিশেষ করে আনন্দের কথা কারণ সারা জগত এতকাল এদের প্রায় অবজ্ঞা করে এসেছে। সেই কারণে যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে এদের মনে একটুখানি ঈর্ষা, একটুখানি আহত

আত্মসম্মানের ভাব। নিজেদের বৈশিষ্ট্য উচ্চারিত করতে তাই তারা সর্বদা উদ্‌গ্রীব—এমনকি পোশাকে এবং ভাষায় পর্যন্ত। এরা অনেকে বলে যে এদের কথার টান ঠিক আমেরিকানদের মত নয়; জায়গায় জায়গায় অবশ্য প্রাদেশিক পার্থক্য থাকতে বাধ্য কিন্তু মোটারকম প্রভেদ আমার কানে কিছু ধরা পড়ে নি। তবে কোনো কোনো শব্দের উচ্চারণে এরা ইংরেজী নিয়ম মানে, যদিও কথার টানে (accent) এবং বানানে তা দেখা যায় না। অনেকে বলে পোশাক দেখেও চেনা যায় আমেরিকানদের, সেই সূক্ষ্ম তারতম্যও আমার চোখে ধরা পড়ে নি।

পররাষ্ট্রনীতিতে আমেরিকার পদাঙ্ক অনুসরণ নিয়ে কাগজে বেতারে তর্ক হয় প্রায়ই। যারা স্বাধীন নীতির পক্ষপাতী তারা ভারতের দৃষ্টান্ত দেয় অথবা কমনওএল্‌থ-এর ধ্বজা তুলে ধরে, অপর পক্ষ ভূগোলের কথা তুলে বলে আমেরিকার দলেই থাকা দরকার। ফলে ক্যানাডা প্রায় দুই নৌকাতেই পা রেখেছে, এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে তার মতামত মোটেই আমেরিকার মত একমুখী নয়, অনেক বেশী বিবেচনাপূর্ণ।

এই যে বিবিধ, আত্মসম্মানপ্রসূত স্বকীয়তার দাবি তা কিন্তু আমেরিকার প্রতি সম্পূর্ণ সৌহার্দ্যযুক্ত। এত বড় শক্তিশালী প্রতিবেশীকে রাগানো কোনো কাজের কথা নয় তা এরা বোঝে। আমেরিকার আওতায় বাইরের আক্রমণ থেকে এরা অনেকটা

নিরাপদ সেটা এদের মস্ত বড় ভরসা। সুদীর্ঘ সীমানা দুই দেশের মধ্যে অথচ একটিও সৈনিক নেই সঙ্গিন উঁচিয়ে, দুই পক্ষই গর্ব করে শোনায় এই কথা। তাছাড়া দুই জাতির গঠনে উপাদান মোটামুটি একই, ভাষাও এক, সেজন্য জ্ঞাতির সম্পর্ক স্বাভাবিক।

পক্ষান্তরে ফ্রান্স, ইংলণ্ড এবং কমনওএল্‌থ-এর সঙ্গেও ক্যানাডার আত্মীয়তা। এমনকি ভারতকেও এরা ঠিক আমেরিকানের চোখে দেখে না। এদের রাষ্ট্রশাসনরীতি আমেরিকার মত নয়, বিলেতের মত গরিষ্ঠ দলের নেতা হয় প্রধান মন্ত্রী,—পার্লামেণ্ট গৃহটা পর্যন্ত ইংরেজের অনুকরণে। রাজনৈতিক দলাদলি অবশ্য নামে মাত্র, সাধারণের মনে অভিযোগ বা বিক্ষোভ এত কম যে রাজনৈতিক মাতামাতি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বাজেটে টাকা এত বেশী হয় যে অর্থ-সচিব মাথা চুলকে বলে আন্দাজের অনুপাতে বেশী জমে গেছে, কী করা যায় এখন!

বেতারের একাংশ আমেরিকার মত স্বাধীন ব্যাবসার হাতে, অপরাংশ ইংলণ্ডের মত সরকারের শাসনে। এতকাল গভর্নর ছিল ইংরেজ, সেদিন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হল নিজেদের লোক (ভিনসেণ্ট ম্যাসি—প্রসিদ্ধ অভিনেতা রেমণ্ড্ ম্যাসির ভাই)। অনেকেই কিন্তু চেয়েছিল ইংরেজ আনতে। রাজকুমারী এলিজাবেথ যখন বেড়াতে এলেন তখন উৎসাহ উপছে পড়ল

দেশময়। এতখানি রাজভক্তি কিন্তু ফরাসীভাষীরা খুব ভাল চোখে দেখে নি।

নায়াগ্রা প্রপাতের কথা না বলে ক্যানাডার কাহিনী শেষ করা যায় না। আসলে প্রপাত আছে দুটি, ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তে—একটি সোজা, অন্যটি ঘোড়ার খুরের মত গোল। হ্রদঘেরা টরণ্টো নগর থেকে মোটরে আসতে হয় ক্ষুদ্র শহর নায়াগ্রাতে। জায়গাটি যেন পর্যটকদের জন্যই তৈরি হয়েছে, প্রায় সব বাড়িই হোটেল কিংবা গেস্টহাউস। এইখানে এসে হানিমুন যাপন করা অনেক তরুণ তরুণীর স্বপ্ন। প্রপাতের কাছে অনেকখানি জায়গা নিয়ে নানারকম আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা। শান্ত নীল জল এগিয়ে আসছে সমতল ভূমি বয়ে, হঠাৎ সেই স্রোত পিছলে পড়ল নিচে, অনেক নিচে, দুপাশে প্রকাণ্ড বাহু মেলে—ছুটন্ত ফুটন্ত পাকানো সাদা ফেনার গর্জনে আকাশ বিদীর্ণ করে! নিচে নদীতে ছোট্ট তরণী 'কুয়াশা কুমারী' (Maid of the Mist) ক্রমাগত যাত্রী নিয়ে যাতায়াত করছে একেবারে নির্ঝরের মূলে, সেখানে সূক্ষ্ম জলবিন্দুর চিরন্তন কুয়াশা—সুতরাং খেয়াতরীর নামটা ঠিকই হয়েছে। লিফ্‌ট দিয়ে মাটির গহ্বরে নেমে প্রপাতের ঠিক পিছনে এসে দাঁড়ানো যায়, সেখান থেকে দৃশ্যটা ঠিক গলানো কাঁচের পর্দার মত। স্যাঁত-

সেতে সুরঙ্গে জলের ঝাপটার থেকে বাঁচবার জন্য রবারের বর্মে আপাদমস্তক মুড়ে আসতে হয় এখানে। নায়াগ্রার ব্যাস আর গভীরতা দুটোই দেখবার মত, এর তুলনায় অন্যান্য প্রপাত মনে হয় যেন ফোয়ারা। দিবারাত্রি তার গম্ভীর গর্জন আকাশে ভাসছে মাইলের পর মাইল। সন্ধ্যার পরে রকমারি রঙিন আলোর খেলা চলে তার উপর, বিচিত্র রামধনুছটায় অপূর্ব মায়ার সৃষ্টি হয় তখন।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের রেষারেষি, তার যা কিছু সবচেয়ে বড় তাই আমরা জয় করতে চাই। সেজন্য যেমন এভারেস্টে চড়া, তেমনি এই প্রপাতের সঙ্গে গড়িয়ে নামার চেষ্টাও কয়েক-জন করেছে—এ পর্যন্ত জিতেছে প্রকৃতি। শেষবারের চেষ্টায় এক যুবক রবারমোড়া পিপের মত এক খোল বানাল, নাম দিল তার The Thing। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এর মধ্যে ঢুকে থাকলে নায়াগ্রার প্রচণ্ড শক্তিও কিছু করতে পারবে না, কিন্তু নায়াগ্রা তা দিল টুকরো করে ভেঙে। যুবকের আকস্মিক মৃত্যুর মতই দেশজোড়া চাঞ্চল্যও দুদিনে মরে গেল।

টরণ্টো এদেশের 'দ্বিতীয়' শহর, সবচেয়ে বড় মন্ট্রিয়ল। এখানে ফরাসী লোকই বেশী। মামুলী দৃশ্যাবলী ছাড়া এ শহরে একটা নতুন জিনিস দেখবার আছে। এক বামন পরিবারের বাড়ি, তার মধ্যে আধুনিক সুখসুবিধার ব্যবস্থা সব আছে, কিন্তু

সবকিছুর আয়তন অতি ক্ষুদ্র, মানুষগুলির মতই। এই খুদে বাড়ির মালিকের গুণ ছিল অনেক এবং সার্কাসের ব্যাবসায় বেশ পয়সাও করেছিলেন। তার বামন সন্তানেরা এখন বাস করছেন সেখানে।

এদেশে রেড ইণ্ডিয়ানদের জন্য পৃথক বাসব্যবস্থা। কাছাকাছি তাদের এক গ্রাম আছে শুনে সেখানে গিয়ে বড়ই ব্যর্থ হতে হল। নাকমুখের গঠনে এবং গায়ের রঙে বাদামী ভাব ছাড়া এদের আর শ্বেতাঙ্গের মধ্যে কোনো ভেদ চোখে পড়ল না; তাও অনেককে দেখে শ্বেতাঙ্গ বলে ভুল হয়। বাড়িঘর পোশাক ভাষা সবই একরকম। শুনলাম বছরের কোনো কোনো বিশেষ দিনে এরা নিজেদের পোশাক পরে মাথায় পালক গুঁজে দেখা দেয়, আমাদের মত দর্শকদের কৃতার্থ করার জন্য।

এই দুই শহরের মাঝামাঝি অটোআ এদেশের রাজধানী। ওআশিংটনের মত এও শুধু গভর্মেণ্টের জন্যই তৈরি, তবে আরো ছোট জায়গা, নিরিবিলি চাঞ্চল্যহীন জীবন। দেশের রাজধানী নিয়ে যখন তর্ক আরম্ভ হয় তখন ফরাসীদের দাবি মন্ট্রিয়ল আর ইংরেজীভাষীদের টরণ্টো এই দুইয়ের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য নাকি রানী ভিক্টোরিয়া বলেছিলেন তৃতীয় শহর বানাতে, তার থেকে অটোআর পত্তন।

এ শহরে থাকার সময় একদিন রুশ রাষ্ট্রদূত স্থানীয়

ভারতীয়দের জন্য এক পার্টির ব্যবস্থা করেছিলেন। আমরা জনদশবারো গিয়ে উপস্থিত হলাম ক্ষুদ্র 'লৌহপর্দা'র ওপারে উঁকি দেবার লোভে। আমাদের দলে ভারতীয় হাই কমিশনার এবং তার দপ্তরের লোকই বেশী। স্টালিনের প্রকাণ্ড ছবি-ঝোলানো ঘরে ওরা সপরিবারে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করলে, তারপর নিয়ে গেল ছোট এক প্রেক্ষাঘরে আজারবেইজান অঞ্চলে তোলা এক চলচ্চিত্র দেখাতে। ছবির কথা অবশ্য এক বর্ণও বোঝা গেল না কিন্তু ওরা আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে বসেছিল ভাল করে বুঝিয়ে দেবার জন্য। গল্প এত সরল যে তা না হলেও চলত। যুবক যুবতীর গোপন প্রেম, মাতৃহীন যুবতীর পুরাতন-পন্থী পিতা এসব পছন্দ করেন না, যুবতী জানলায় বসে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে, যুবক ধোবা সেজে বাড়িতে ঢুকে তার সঙ্গে দেখা করে, ফুলগাছের সামনে দাঁড়িয়ে গান করে। অবশেষে আরেকটি মহিলাকে এনে বাবার মন ভোলানোর ব্যবস্থা করে তাদের মিলন হল। ভারতীয় ছবির সঙ্গে আশ্চর্য মিল দেখা গেল—শুধু কাহিনীতে নয়, পোশাকে বাড়িঘরে আসবাবপত্রে। ভৌগোলিক সান্নিধ্যের তুলনায় রাজনৈতিক সীমানা যে তুর্বল এও তার এক নিদর্শন।

ছবি দেখার পরে মিষ্টিমুখের পালা। নানারকম স্যাণ্ডুইচ কেক ইত্যাদি টেবিলে সাজানো—আর ভড্‌কা। ও জিনিসটার

সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়,—জলের মত বর্ণহীন পানীয় কিন্তু আর কিছুতে মিল নেই জলের সঙ্গে, অল্প চুমুকে না খেলে বিপদ। ওরা তা শুনতে রাজী নয়, কি ভোজ্য কি পানীয় হাত খালি হতে না হতে আবার দিচ্ছে পূর্ণ করে, আর হাসিতে গল্পে অতিথি পরিচর্যা করছে পরম উৎসাহে। গল্পে গল্পে নতুন জিনিস জানা গেল অনেক, নতুন পরিচয়ের আনন্দে মন তাজা হল,—ঠিক যেমন হতে পারে যে কোনো দেশে অতিথিপরায়ণ সজ্জন ব্যক্তির ঘরে।

অটোআতে আরেকটি পরিচয়ের কথা মনে পড়ে। ভারতীয় পর্যটক নরসিংহম্ সাইকেলে চড়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে, তার সঙ্গে দেখা হল। মাত্র কয়েক পয়সা সঙ্গে নিয়ে সে দেশ ছেড়েছিল, য়োরোপ ঘুরে এসেছে এই মহাদেশে, এর পরে জাপানের পথে দেশে ফিরবে এই তার ইচ্ছা। সংবাদপত্রে লিখে, বেতারে বক্তৃতা দিয়ে এবং প্রবাসী ভারতীয়দের সাহায্যে তার দিন চলে। ভারতে নির্মিত সাইকেল এতদিন বেশ চলেছিল কিন্তু তখন প্রায় অচল, তাই তাকে একটু চিন্তিত দেখলাম। অটোআ ত্যাগের পরে শুনেছি নতুন বাহন জুটিয়ে আবার সে বেরিয়ে পড়েছে পৃথিবীর পথে।

ইটালি ও ফ্রান্স

১৯৫১-৫২ সালে আবার কিছুদিন য়োরোপে কাটাবার সুযোগ হল। এখন আর মহাসমরের ভগ্নাবশেষ ছড়ানো নয় পথেঘাটে, আমেরিকান সেনা গেছে দেশে ফিরে। ইটালির মুদ্রাস্ফীতি অনেক কম, বিদেশী টাকার বদলে লিরা মেলে এখন আগের প্রায় অর্ধেক। ফ্রান্সকে আর্থিক ধ্বংসের থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে আমেরিকার টাকা: মার্শাল প্ল্যান না হলে আজ সে দেশে জিনিসের দাম কোথাও গিয়ে থামত কিনা সন্দেহ, সরকারী দপ্তরে মাইনে দেবার টাকা থাকত না।

ইটালি যে আমাদের কত কাছে তা ঠিক বোঝা যায় বিমান-যাত্রায়। বিকেল ছটায় বম্বে ছেড়ে পরদিন ভোর না হতে ভূমধ্য সাগরের চোখ-জুড়ানো গাঢ় নীল পটে ইটালির প্রলম্বিত বুট দেখা যায় ঠিক প্রকাণ্ড এক মানচিত্রের মত। তারপর প্রাতরাশ সারতে সারতে নেপল্‌স ও কাপ্রি চোখের সামনে ভেসে গেল, দেখতে দেখতে সোনালী সূর্য চকচক করে উঠল রোমে—প্রথমে সেইণ্ট পল গীর্জা তারপর আরো কত পরিচিত

দৃশ্য। পাড়ি পশ্চিম দিকে তাই রাত হয়েছে প্রলম্বিত, গদি আঁটা আরাম-কেদারায় প্রায় চিত হয়ে শুয়েও ভাল ঘুম হয়নি —এর পরে ভোরের শান্ত শীতল আলোয় ইটালির সোনালী দরজা দিয়ে য়োরোপ প্রবেশ দেহের ক্লান্তি মনের জড়তা সব হরণ করে নিল মুহূর্তে। দুই সপ্তাহ ধরে ধীরে ধীরে জলপথে অগ্রসর হলে কখনো সম্ভব হত না এই আশ্চর্য শিহরণ, পৌঁছানোর আগেই ছুটির অভ্যাস এসে যেত এত দিনের অনন্যোপায় বিশ্রামে। ছুটির পূর্ণ রোমাঞ্চ তাই বিমানযাত্রা ছাড়া জানা যায় না। তাছাড়া সঙ্গে আনতে পেরেছি তাজা ন্যাংড়া আম বন্ধুদের জন্য ; কাল বিকেলে যে আম ছিল বম্বের বাজারে আজ সকালে তা সাজানো ইটালীয় টেবিলে, লুব্ধ ল্যাটিন দৃষ্টির সামনে।

যে জিনিস ভাল লাগে প্রথম দৃষ্টিতে প্রথম শ্রুতিতে তার দিকে চোখ মেলে কান পেতে বসে না থেকে বারে বারে ঘুরে ঘুরে এলে আমার মনে হয় জানা হয় আরো সম্পূর্ণ, উপভোগের আনন্দ বাড়ে সবচেয়ে বেশী। দেখার প্রথম ভাগে নতুনত্বের মাদকতা, দ্বিতীয় ভাগে আত্মীয়তার আনন্দ। তারই আস্বাদনে কাটল কিছুদিন রোম নগরীতে, আধুনিক আর পৌরাণিকের অন্তরাত্মার নিশ্বাস যার বাতাসে। কিন্তু এবারের প্রথম ইচ্ছা ছিল যে যে ক'টা দিন হাতে আছে তা কাটাব

এসব কিছুর বাইরে, শহর আর লোকজনের থেকে দূরে, যেখানে নেই দেখে বেড়াবার তাগিদ।

এক বন্ধু নির্দেশ দিল পাহাড়ের ছায়ায় এক ছোট্ট ঘরোয়া শহরের, নাম রকা দি পাপা (পোপের পাথর)। সকালবেলা রোমের বিখ্যাত নতুন রেলস্টেশনের সামনে এসে বাসে চড়লাম, ঘণ্টাতিনেক পরে নামিয়ে দিল সেখানে। কিন্তু দেখে শুনে মনে হল যা চেয়েছিলাম এ যেন ঠিক তা নয়। দুতিনটে হোটেলের লোক ঘিরে ধরেছে, সুটকেস নিয়ে দাঁড়িয়ে একাগ্রে পাহাড়ের দিকে তাকাচ্ছি আর ভাবছি কি করা যায় এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল তারই একটার সূচ্যগ্র চূড়ায় ছোট্ট এক সাদা বাড়ি। কী ওটা, কে থাকে ওখানে? ওরা বললে, কেউ না বড় একটা, নাম মন্টি কাভো (গুহা পাহাড়), পুরনো কালের এক পরিত্যক্ত মঠ, সেখানে একজন বানিয়েছে সরাইখানা। খাবার ভাল, সেজন্য অনেকে ছুটির দিনে চড়ে খেতে, কিন্তু কেউ থাকে না ওখানে,—জলের কষ্ট, গরম জল তো একেবারেই পাওয়া যায় না, তার চেয়ে এখানে আছে অনেক সুন্দর হোটেল, একেবারে আধুনিক বাসব্যবস্থা—

কিন্তু ততক্ষণে আমার মন ঠিক হয়ে গেছে, মিষ্টবাক্যে শুভার্থীদের নিরস্ত করে গাড়ির খোঁজ করলাম। কোনো ট্যাক্সি অতখানি চড়তে রাজী নয় যদি আবার ফিরে না আসি।

একজন জানালে মালিকের একটা গাড়ি বাজার করতে ওঠানামা করে, সেটা ধরতে পারলে উঠে যাওয়া যায়। টেলিফোনে সেই ব্যবস্থা করা সম্ভব হল, মালিক জানালে গাড়ি শিগগিরই তুলে নেবে আমাকে, খুব ভাল ঘর আছে, তবে স্নান কিন্তু সম্ভব হবে না।

নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামে কাটল কয়েকটা নিরিবিলি দিন। রোমে তখন বেশ গরম হলেও মন্টি কাভোর হাওয়া ঠাণ্ডা, স্নানের অভাবে খুব কষ্ট হত না। দোতলা পাথরের বাড়ি, ছোট ছোট নিচু ঘর, রুক্ষ আসবাবপত্র। সরাইয়ের মালিক ও তার স্ত্রী ছাড়া বাড়িতে লোক শুধু একটি মহিলা আর তার ছোট মেয়ে। দিনের বেলাও নিঝুম তন্দ্রায় মগ্ন সারা বাড়ি, পুরনো কালের সন্ন্যাসীদের আত্মা যেন এখনো ঘিরে আছে তাকে। সময়ের কোনো হিসেব ছিল না। সকালবেলা ঘুম ভাঙাত একটি মেয়ে রুটি, জ্যাম আর গরম চকোলেট হাতে নিয়ে দরজায় আঘাত করে। জানলার বাইরে তখনো একটু কুয়াশা, বেরোতে বেরোতে তা কেটে যেত, বাইরের ওঠোনে মিষ্টি রোদে পিঠ পেতে বসতাম বই বা চিঠি লেখা নিয়ে। নিচে অনেক দূরে রকা দি পাপা-র ঘরবাড়ি পরিত্যক্ত পৃথিবীটার একমাত্র চিহ্ন। ক্রমে রোদ চড়লে প্রকাণ্ড রঙিন ছাতার নিচে আশ্রয় নিতে হত। তারপর সেখানে বসেই খাওয়া; খাদ্যে বৈচিত্র্য বেশী নেই, রোজই প্রায় স্পাগেটি আর স্টেক, কিন্তু স্বাদ অতুলনীয়—স্পাগেটির সঙ্গে চীস এবং

মাংস বা টোমাটোর রসের অনুপান একেবারে সঠিক, স্টেক একেবারে নিজের রুচিমাফিক কোমল। সঙ্গে সুশীতল ইটালীয় মদিরা এবং পরে তাজা ফল নানারকম। ছুটির দিনে ভোজনের বহর অবশ্য বাড়ত, রোম থেকে আসত দলে দলে লোক, আমেরিকান টুরিস্ট পর্যন্ত; অনেক পাচক পরিবেশক ভাড়া করে এনেও হোটেলের কর্তা হাঁপিয়ে যেত কাজে।

রাতে খাবার টেবিল বাড়ির ভিতরে। অনেকক্ষণ ধরে আস্তে আস্তে খেয়ে, নিজেদের মধ্যে গালগল্প করে (তার মধ্যে এসে পড়ত সুখদুঃখের কথা পর্যন্ত) ঘড়ির কাঁটা যেন নড়ে না। অবশেষে ঘুমের অজুহাতে ঘরের দিকে যাওয়া। নির্জন বাড়ির সরু সরু অলিগলি স্তিমিত আলোয় থমথম করে, কোন কালের কোন ধ্যানমগ্ন বৈরাগীর লঘু পদক্ষেপের প্রতীক্ষায় কান পেতে যেন। ঘরে এসে জানলার কাছে কাটত অনেকক্ষণ—দূরে রোমের আলোর এক অপূর্ব দৃশ্য, চেয়ে চেয়ে যেন আশ মিটত না। যে কোনো শহরের আলো দূর থেকে দেখতে সুন্দর কিন্তু নিউ ইয়র্ক কখনো এমন মায়াময় মূর্তিতে দেখা দিতে পারে না। মনে হত কোন রূপকথার দেশের রঙিন প্রদীপের মেলা পৃথিবীর অন্ধকারের ওপারে মিটমিট করে জ্বলছে। তারপর বিছানায় ঢুকতাম বই নিয়ে, ঐ অখণ্ড শান্তির মধ্যে ঘুম আর জাগরণ যে কখন মিশে যেত টের পেতাম না।

কিছুদিন এই স্বপ্নময় নির্জনতার পরে ছুটতে হল ব্যস্ত লণ্ডনের দিকে। সেদেশে যুদ্ধের পর থেকে আজ পর্যন্ত পরিবর্তন এসেছে সামান্য, আজো ওদের আশায় আশায় দিন কাটছে কিন্তু দুর্ভোগ যেন শেষ হতে চায় না। অবশ্য দোকানে জিনিস এসেছে বেশী, রেশনের কড়াকড়ি উঠে গেছে, কিন্তু ভাঙা সাম্রাজ্যের ক্ষতিপূরণ হবে কিসে ?

কিন্তু সেকথা এখানে নয়। ইংলণ্ডের উল্লেখ এ বইয়ের পাতায় অনেক জায়গায় আছে কিন্তু গুছিয়ে কিছু বলছি না তার কারণ ওদেশের বিস্তারিত কাহিনী আছে অন্যত্র। সে বইয়ের নাম 'সব হারানোর দেশে'।

•

আমেরিকা আর য়োরোপের মধ্যে যত খেয়াতরী, চলার বেগে তাদের রানী ছিল কুইন মেরি ও এলিজাবেথ, কিন্তু মুকুট কেড়ে নিল নতুন মার্কিন জাহাজ 'আমেরিকা'। আগাগোড়া হাওয়া-নিয়ন্ত্রিত আধুনিকতম আরামে সজ্জিত এই বেগবতী তরণীর দিকে তখন সকলের নজর, কিন্তু আকৃতিতে ঐ পুরাতন রানীরা এখনো অপ্রতিদ্বন্দ্বী। জায়গা পাওয়া গেল বৃহত্তম জাহাজ কুইন এলিজাবেথে। এদিকের পাড়িতে অবশ্য য়োরোপীয় আশ্রয়প্রার্থীর ভীড় নেই, অধিকাংশই আমেরিকান পর্যটক। আমার কামরায় তিনজন সঙ্গী। একজন যুদ্ধের

পরে চেকোস্লোভাকিয়া ছেড়ে এসে এদেশে ঘর বানিয়েছেন, এখন কাপড়ের ফিরিওলা, য়োরোপে যাচ্ছেন রকমারি নমুনা নিয়ে—অবশ্য কাজের চেয়ে মজার দিকেই তার ঝোঁক বেশী। দ্বিতীয় ব্যক্তি যাজক, ইংলণ্ডে যাচ্ছেন এক ধর্মসম্প্রদায়ের অধিবেশনে, তারপর অবশ্য বেড়াবেন কিছু। আরেকজনের উদ্দেশ্য সবচেয়ে আশ্চর্য, ইনি শৈশবে ইংলণ্ডের লীড্‌স শহর ছেড়ে এসে এদেশের নাগরিক হয়েছেন, এখন প্রৌঢ় বয়সে চলেছেন ফিরে শুধু ঐ শহরে দিনদশেক কাটাবার জন্য। বন্ধুদের নাম সব মনে আছে, ঠিকানাও লেখা আছে, যদিও কারো সঙ্গে যোগাযোগ নেই। পুরনো ভাসা ভাসা ফোটো অনেক দেখালেন বার করে; এদের মধ্যে যারা বেঁচে আছে তারা কেউ হয়তো ঠাকুরমা ঠাকুরদা আজ; হঠাৎ তাদের সামনে হাজির হলে কেমন মজা হবে সেইটে দেখবার জন্যই প্রধানত তার য়োরোপ যাত্রা।

এদের সঙ্গে অবশ্য দিনের মধ্যে অল্পই দেখাশোনা হত। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সময়মত খেতে যাবার তাড়া থাকে; বিকেলে চায়ের পর ফিটফাট হবার জন্য সকলে আসত ঘরে, সেই সময়ই পরস্পরের সঙ্গে পরিচয়। বাকি দিনটা জাহাজের জনারণ্য গ্রাস করে নেয় সবাইকে। যাদের কপাল ভাল তারা সংগ্রহ করতে পেরেছেন ডেক চেয়ার (প্রাণপণে রোদ শুষতে শুষতে দুদিনের মধ্যেই লাল ছাল বেরিয়ে এল তাদের গা থেকে,

আমি গর্ব করে দেখাই আমার অক্ষত ত্বক), বাকি যারা তাদের জন্য অবশ্য আছে খেলাধুলো লাইব্রেরি রকমারি লাউঞ্জ, কিন্তু সবচেয়ে যা প্রয়োজন—হেঁটে বেড়াবার জায়গা—এ জাহাজের টুরিস্ট ক্লাসে তার বড় সংকোচ। প্রথম কিংবা কেবিন শ্রেণীতে থাকতে না পারলে ছোট জাহাজ এর চেয়ে ভাল। সুবিধার মধ্যে অবশ্য দোল নেই একেবারেই, তাছাড়া সিঁড়ি ভাঙতে হয় না, সাত আট তলা ওঠানামা করা যায় লিফ্‌ট দিয়ে।

অধিকাংশ ছুটির যাত্রীর প্রথম লক্ষ্য অবশ্য প্যারিস। এ আর আমাদের বিলেত যাওয়ার মত সাত সমুদ্র পাড়ি নয়, দিনচারেকের মধ্যে এসে গেল শেরবুর্গ বন্দর—সমুদ্রযাত্রার একঘেয়েমি ভাল করে পেয়ে বসবার আগেই। সঙ্গীদের সঙ্গে ঠিকানা অদলবদল করে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায়ের পালা শেষ হল সকালবেলা, ট্রেন যখন প্যারিসে এল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আশ্রয় ঠিক করে জামাকাপড় বদলে খেতে বেরিয়েছি। দেখা গেল মিতব্যয়ে খাওয়া এ শহরে এখন আগের চেয়ে আরো কষ্টসাধ্য। খাবারের দাম তো বেশী বটেই, তাছাড়া পয়সা দিতে হয় টেবিল-ঢাকনা, ট্যাক্স ও বকশিশ বাবদ; বাঁধা বকশিশের উপরেও আলাদা কিছু না দিলে পরিবেশক যেন মুখ ভার করে থাকে।

সারাদিনের ধকলে শরীর খুব ক্লান্ত কিন্তু রেস্তরাঁ থেকে

বেরিয়ে দূরে প্যারিসের আলো দেখে ঘরের দিকে আর পা চলে না। আকাশ জুড়ে যেন আলোর বন্যা। ঈষৎ বিস্ময়ে মুগ্ধ পতঙ্গের মত এগিয়ে চললাম। একটু বসি একটু চলি করতে করতে প্লাস দ লা কংকর্ড, অ্যাভিনিউ শঁসেলিজে ইত্যাদি পেরিয়ে এসে পৌঁছালাম যখন জয়তোরণের গোড়ায় তখন প্রায় মধ্যরাত্রি। পথেঘাটে বাড়িতে দোকানে আজ আলোর মেলা, তার মধ্যে ফোয়ারাগুলি জ্বলছে প্রকাণ্ড ফুলঝুরির মত। নিউ ইয়র্কের রাত্রি কত অন্যরকম! টাইম্‌স স্কোয়ারের কর্কশ আলো চোখ বন্ধ করায়, দোকানের বিজ্ঞাপন চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়; এখানে কংকর্ড-চক্রে আলোর মেলা দেখে দেখে আশ মেটে না, প্যারিস বিপণির দ্রব্যসম্ভার যেমন মনোরম তার দীপমালাও তেমনি রুচিসম্মত। সেদিন যেমন রাত দুটো পর্যন্ত প্রায় চৌদ্দ মাইল হেঁটে বেড়ালাম সব ক্লান্তি ভুলে, আমেরিকার কোনো শহরে তা সম্ভব হত না নিশ্চয়। পরে জানা গেল সেটা ছিল ওদের বিশেষ উৎসবের দিন, বাস্‌টী দিবস।

এবারেও লক্ষ ছিল শহর থেকে দূরে ফ্রান্সের অন্য মূর্তির দিকে। প্যারিসের অল্প সময়টুকু কেটে গেল নদীর এপারে ওপারে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে পুরনোকে নতুন করে চিনতে। নদীতে আনাগোনা করে গোটাকয়েক ছোট জাহাজ ভ্রমণার্থীদের নিয়ে, একটার নাম 'মাছি নৌকা', তাতে চড়ে অনেকদূর পর্যন্ত

ঘুরে আসা গেল সেইন নদীর বহু প্রসিদ্ধ সেতুর নিচ দিয়ে। নদীর হুপারে বড় বড় অক্ষরে লেখা 'আমেরিকানরা ঘরে ফিরে যাও', কোথাও খড়ি দিয়ে তীর এঁকে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে যাতে ফিরে যাবার রাস্তা ভুল না হয়। জাহাজে অধিকাংশই আমেরিকান, আমরা বাকি কয়েকজন সেদিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ভুললাম না পদে পদে—তা নিয়ে খুব হাসাহাসি।

তারপর একদিন সকালে লিয়ঁ স্টেশন থেকে ট্রেন ধরলাম পুবে আল্প্‌স পর্বতমালার দিকে। দশঘণ্টার পথ, কিন্তু বুর্গ পর্যন্ত এত দ্রুত এল গাড়ি যে বিশ্বাস হয় না বাকিটুকু যেতে দিন কেটে যাবে। কিন্তু ঐ স্টেশনে মাত্র কয়েকটি কামরা কেটে দিয়ে ট্রেন চলে গেল দক্ষিণে (শুনেছি এই ট্রেন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত) আর আমরা চলা শুরু করলাম ঢিমে তেতালা চালে আল্প্‌সের এলাকার মধ্য দিয়ে।

খাড়া পাহাড়ে চড়া আরম্ভ হল বিকেলে বড় গাড়ি ছেড়ে ছোট লাইনের এক পার্বত্য ট্রেনে। হ্রদ ঝরনা বনে ঘেরা পাহাড়ের কোলে ছোট্ট ছোট্ট গ্রামে সে থামে, এর যে কোনো জায়গায় দেহমন জুড়িয়ে চমৎকার ছুটি উপভোগ করা চলে। সব কিছুর ঊর্ধ্বে Mont Blanc পর্বতের তুষারমণ্ডিত শ্বেত শিখর ধ্যানমগ্ন। পান্থশালার ঘরে যখন এসে ঢুকলাম তখন অন্ধকার হয়ে গেছে কিন্তু জানলা দিয়ে যে দৃশ্য চোখে পড়ল তা

ভুলবার নয় ; আঁধার-নীল আকাশের গায়ে প্রকাণ্ড মুকুটের মত জ্বলছে শ্বেতশিখর ; সূর্য ডুবে গেছে অনেকক্ষণ কিন্তু তখনো গলানো সোনা ঢালছে সে পাহাড়ের চূড়ায়, তুষারের বাঁকে বাঁকে শেষ আলোর খেলায় কত রঙের বিচ্ছুরণ। এর পরে রোজ সন্ধ্যায় এই দৃশ্যের ক্রমপরিবর্তন না দেখলে চলত না। ওপারে সুইৎসার্লাণ্ড ও ইটালির থেকেও নিশ্চয় সূর্যোদয়ের আগে দেখা যায় এই দৃশ্য।

বিদেশী পর্যটক এসব অঞ্চলে বেশ চোখে পড়ে—আমেরিকান টুরিস্ট ছাড়া। চঞ্চল আমোদপ্রমোদের অভাবে এখানে হয়তো তাদের প্রাণ হাঁপিয়ে উঠবে, অথবা এখনো হয়তো খোঁজ পায়নি তারা এসব ছোট জায়গার। প্যারিস লণ্ডন বা জেনিভার পরে সেজন্য এই পরিপূর্ণ য়োরোপীয় আবহাওয়া আরো ভাল লাগে। য়োরোপীয়তা ক্রমেই যেরকম দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে য়োরোপে তাতে মনে হয় এই ধরণের বিরল সুযোগও আর বেশীদিন হয়তো মিলবে না।

যারা আসে এসব জায়গায় বেড়াতে তাদের প্রধান লক্ষ্য অল্প খরচে ভাল খাওয়া এবং নিরিবিলিতে দেহমনের পরিপূর্ণ বিশ্রাম। ফরাসী রান্নার গুণ এখানে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, খাদ্যেরও অভাব নেই। হাজার ফ্রাংকের কিছু বেশী (দৈনিক পনের টাকা) দিলে ভাল ঘর আর তিন বেলার আহার পাওয়া

যায় এদের পেনশন রীতি অনুসারে, অর্থাৎ এক জায়গায় দিন আষ্টেক থাকলে। প্যারিসে এক বেলা খেতেই লাগে প্রায় চারশো ফ্রাংক, অবশ্য নদীর বাম তীরে খুঁজে বেড়ালে কিছুটা সস্তা অথচ ভাল রেস্তরাঁও পাওয়া যায়।

তখন গ্রীষ্মের দিনে প্রায় রোজই সূর্য উঠত প্রখর হয়ে, গরম জামা পরা চলত না কিন্তু রাতে দরকার হত তিনটে কম্বল। অকাজের দিন কাটে একটু হেঁটে একটু পড়ে বা কিছু না করে শ্বেতশিখরের দিকে চেয়ে চেয়ে; ছোট্ট এক মনিহারী দোকান গ্রামের প্রধান বাজার, ট্রেনের বাঁশী শোনার পর সেখানে গিয়ে দৈনিক কাগজ বা ছবির পোস্টকার্ড কিনে আনা, তার মধ্যে দুলাইন লিখে আবার পোস্টাপিশে যাওয়া—দিনের মধ্যে এই বড় কাজ। প্যারিসের কাগজে চঞ্চল বিশ্বের খবর ঠাসা কিন্তু ঐ দূরের উত্তেজনা যেন ভাল করে গায়ে লাগতে চায় না এখানে। ফারুকের নির্বাসন, ইভা পেরনের মৃত্যু, ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার বিবিধ খবর, এসবের চঞ্চল ঢেউ এতদূর পৌঁছাবার আগেই মরে যেত। ঐ ষোল হাজার ফুট উঁচু শ্বেতশিখর এখানে আর সব কিছুর চেয়ে বেশী প্রত্যক্ষ বেশী বাস্তব।

সকালে বিকেলে হেঁটে বেড়ানোর মধ্যেও আছে এক নির্জনতা, নিঃশব্দতার আনন্দ। কোনো রাস্তার বাঁকে হয়তো ছোট্ট এক সেকেলে মঠ, কোথাও পাহাড়ের গায়ে কার পরিত্যক্ত সুন্দর

বাগানবাড়ি। এ অঞ্চলের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে নদী উপনদী বয়ে চলেছে শিরা উপশিরার মত। এক দলের লোক ছুটি কাটাতে আসে নদীর তীরে পাহাড়ের ছায়ায় তাঁবু খাটিয়ে। এরা হ্রস্ব দেহাবরণে রোদ পোহায়, ঝুপঝাপ করে জলে নামে, দাড়ি কামাতে ভুলে যায়, গাছের নিচে টেবিল পেতে খায়। এই বন্য জীবনে আর যাই হক স্নানটা হয় ভাল, হোটেলে তা সহজ নয়। কিন্তু চোর ডাকাতের ভয় আছে।

পাহাড়ের গায়ে কাটা সরু পথ, একদিকে উত্তুঙ্গ পাথরের প্রাচীর, অন্যদিকে খাড়া খাদ। ঝরনা আর ঝোরার ছড়াছড়ি, তাদের কলকাকলি অনুদিন কানে লেগেই আছে। রাতে কম্বলের নিচে শুয়ে ঠিক জানলার নিচেই তাদের ঘুমপাড়ানী গান।

এসব যদি একঘেয়ে হয়ে আসে খুব, তবে কাছাকাছি কোনো ছোট শহরে বেড়াতে গিয়ে কিছুটা বৈচিত্র্য ও উত্তেজনার স্বাদ নিয়ে ফেরা যায়। সুইস সীমানার গা ঘেঁষে আছে ছবির মত সুন্দর শহর শামনি (Chamonix), এখানে আবহাওয়াটা ততটা ঘুমন্ত নয়, পথঘাট দোকানপাট হোটেল অনেক বেশী চকচকে, টুরিস্টের ভীড় বেশী। এখান থেকে পাহাড় কেটে এক প্রকাণ্ড সুরঙ্গ তৈরি হচ্ছে সুইৎসার্লাণ্ড আর ইটালির সঙ্গে এদেশের যোগ স্থাপনের জন্য। এর কিছু দূরে সুপ্রসিদ্ধ 'তুষার সাগর' (La Mer de Glace) দেখতে যাওয়া যায় পার্বত্য ট্রেনে চড়ে।

যেখানে দাঁড়িয়ে দেখতে হয় এই আশ্চর্য দৃশ্য সেখানে গ্রীষ্মের দিনে ঠাণ্ডা এমন কিছু বেশী নয়, অথচ অনেক নিচে নদী জমে আছে এ যেন দেখেও বিশ্বাস হতে চায় না ; রোন গ্লেসিয়ার সেই কারণে এর কাছে হার মানে। মনে হয় এ নদী যেন ঠাণ্ডায় জমে নি, কোন মায়াকাঠির ছোঁয়ায় হঠাৎ স্থির হয়ে থেমে গেছে,—প্রকাণ্ড ঢেউগুলি যদি আবার হঠাৎ চোখের সামনে ভেঙে পড়ে তবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

অবশেষে আল্প্‌স ত্যাগ করে নেমে আসতে হল নিচের জগতে। রাস্তায় পড়ল আনেসি (Annecy) শহর, ভ্রমণার্থীদের মুখে মুখে এর সৌন্দর্যের খ্যাতি খুব শুনেছি যদিও এক হ্রদ ছাড়া কি আছে জানিনা। মতলব ছিল সেখানে একদিন কাটাব কিন্তু এমনি আশ্চর্য অভিজ্ঞতা যে সারাদিন ঘুরে ঘুরেও আশ্রয় জুটল না এক রাত্রির। বিকেলের দিকে ট্যাক্সিতে করে জেনিভায় পলায়ন করে নিষ্কৃতি, সুইস হোটেলের সুন্দর ঘরে নরম গদিতে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে মনে হল এই ভাল, অনেক ভাল।
